জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

National Institute of Mass Communication Journal

বর্ষ ৭ | সংখ্যা ৭ | ১৪৩১
Year 7 | Volume 7 | 2024

ISSN 2789-780X

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

National Institute of Mass Communication Journal

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

National Institute of Mass Communication Journal

বর্ষ ৭	সংখ্যা ৭	১৪৩১
Year 7	Volume 7	2024

উপদেষ্টা

সুফী জাকির হোসেন

অতিরিক্ত মহাপরিচালক

সম্পাদক

ড. মোঃ মারুফ নাওয়াজ

পরিচালক (প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান)

নির্বাহী সম্পাদক

মো: মাসুম-উল-আলম

সহকারী পরিচালক (বেতার অনুষ্ঠান প্রশিক্ষণ)

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

তানিয়া খান, উপপরিচালক (সংযুক্ত)

সালমা আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)

মোঃ সোহেল পারভেজ, উপপরিচালক (চলচ্চিত্র)

আইরিন সুলতানা, উপপরিচালক (গবেষণা, চলতি দায়িত্ব)

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

National Institute of Mass Communication Journal

বর্ষ ৭	সংখ্যা ৭	১৪৩১
Year 7	Volume 7	2024

সম্পাদক	:	ড. মোঃ মারুফ নাওয়াজ
নির্বাহী সম্পাদক	:	মো: মাসুম-উল-আলম
প্রকাশক	:	মহাপরিচালক জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা	:	আনোয়ার সাদাত রবি
কম্পিউটার কম্পোজ	:	জি.এম. সাইফুল ইসলাম ও হাবিবুল বাসার
মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা	:	নিউ তিস্তা প্রিন্টাস ১৪২, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা
মূল্য	:	১০০ (একশত)
Price	:	100 (One Hundred) Taka
পরিবেশক	:	জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

যোগাযোগ

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

১২৫/এ, দারুস সালাম, এ. ডব্লিউ. চৌধুরী রোড, ঢাকা-১২১৬

ফোন: ৫৫০৭৯৪২৮, ফ্যাক্স: +৮৮০২৫৫০৭৯৪৪৩

email: dg@nimc.gov.bd

Website: www.nimc.gov.bd

Contact

National Institute of Mass Communication

125/A, Darus Salam, A. W. Chowdhury Road, Dhaka-1216.

Phone; 55079428, Fax: +880255079443

email: dg@nimc.gov.bd

Website: www.nimc.gov.bd

মুখবন্ধ

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নালের ৭ম সংখ্যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

'জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল' এদেশের গণমাধ্যমের উত্তরোত্তর বিকাশ ও চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এই চর্চার ধারাবাহিকতায় সংখ্যাটি সপ্তম। 'জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল' আন্তর্জাতিক ISSN (International Standard Serial Number) সনদপ্রাপ্ত একটি জার্নাল।

গণযোগাযোগ ও নিউ মিডিয়া চর্চাকে ফলপ্রসূ ও বেগবান করতে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিদগ্ধ লেখক-গবেষকদের কাছ থেকে প্রিন্ট মিডিয়ায় লেখা আবেদন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে লেখা সংগ্রহ করে থাকে। বর্তমান সংখ্যাটিকে স্কলারলি জার্নাল হিসেবে প্রকাশের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা, পদ্ধতি এবং প্রাপ্ত লেখা থেকে নির্বাচিত লেখা বিশ্লেষণ-মূল্যায়নকারীদের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়েছে। এই অবকাশে সম্মানিত গবেষক ও বিশেষ-মূল্যায়নকারীদের জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা।

প্রকাশিত জার্নালটিতে অন্তর্ভুক্ত ৭ (সাত) টি লেখায় গণযোগাযোগ ও নিউ মিডিয়া, গণমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্র ও নাট্যসাহিত্য পর্যালোচনা, প্রিন্ট মিডিয়া সম্পর্কিত মৌলিক পর্যালোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, লেখাগুলো গণমাধ্যম বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং গবেষকদের নিকট বিশেষ প্রয়োজনীয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

গণমাধ্যমের উন্নয়ন তথা বিকাশের প্রয়োজনে ইলেক্ট্রনিক, প্রিন্ট মিডিয়া ও নিউ মিডিয়া সম্পর্কিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ এবং শিল্প-সাহিত্য-ইতিহাসভিত্তিক মানসম্মত বিশ্লেষণমূলক লেখা প্রকাশ করা 'জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল' প্রকাশের অভীষ্ট। সেক্ষেত্রে, সারগর্ভ, মৌলিক গবেষণা-পর্যালোচনা সমৃদ্ধ লেখার কোনো বিকল্প নেই। এই অনুষঙ্গে, আমি জার্নালের আগামী অষ্টম সংখ্যায় লেখার জন্য লেখক-গবেষকদের প্রতি সনির্বন্ধ আহবান জানাচ্ছি।

জার্নালটি প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতা ও পৃষ্টপোষকতার জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতি রইল বিশেষ কৃতজ্ঞতা। একইসঙ্গে, সংখ্যাটি প্রকাশের জন্য সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। সকলের সহযোগিতা আমাদের ভবিষ্যৎ চলার পথকে অর্থবহ করবে– এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

সুফী জাকির হোসেন
অতিরিক্ত মহাপরিচালক

সম্পাদকীয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার অভিপ্রায়ে গণমাধ্যমকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮০ সালে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল গঠনের উদ্দেশ্যে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গণমাধ্যমকে উপযোগী, দক্ষ ও যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলা এবং চলচ্চিত্র ও গণযোগাযোগ কর্মকান্ডের উন্নতি সাধনই জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মূল লক্ষ্য।

গণমাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্কিত উদ্ভাবনপ্রিয় সৃজনশীল মানুষেরা তাঁদের নিজ নিজ প্রয়োজন ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই এনআইএমসি জার্নালে তাঁদের গবেষণাধর্মী লেখা দিয়ে বরাবরই জার্নালটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়াধীন জাতীয় গণমাধ্যম ইনসিটটিউটের অনুষদ সদস্যবৃন্দ, লেখক, শিক্ষক, সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের সমন্বিত উদ্যেগের ফসল 'জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল'। সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক অভিনন্দন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এবং সম্মানিত সচিব মহোদয়ের দিক-নির্দেশনায় জার্নালটিকে অ্যাকাডেমিক ও আন্তর্জাতিক মানে রূপান্তরের অভিপ্রায়ে এনআইএমসি জার্নাল সম্পাদনা পরিষদ সর্বাত্নক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এনআইএমসি-র এবারের জার্নালটিকে অ্যাকাডেমিক জার্নাল হিসেবে প্রকাশের নিমিত্ত প্রতিটি লেখাই 'পিআররিভিউ' মূল্যায়ন পদ্ধতিতে যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। 'জার্নাল সম্পাদনা পরিষদ' কর্তৃক প্রাপ্ত প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত লেখাগুলো বিশেষজ্ঞ-মূল্যায়নকারীদের নিকট প্রেরণের মাধ্যমে লেখাগুলো চূড়ান্ত করা হয়।

একটি আন্তর্জাতিক মানের জার্নাল প্রকাশের লক্ষে বাংলা এবং ইংরেজিতে লেখার জন্য 'রেফারেন্স নীতিমালা' লেখকের নিকট প্রেরণের পাশাপাশি এনআইএমসি-এর ওয়েবসাইটে (লেখকের জন্য জ্ঞাতব্য) আপলোড করা হয়েছে। গণমাধ্যমের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় গণমাধ্যমের বিস্তৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান, গবেষণা ও বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ রচনায় প্রেরিত 'রেফারেন্স নীতিমালা' লেখকদেরকে জার্নাল-উপযোগী লেখা লিখতে সহায়ক হবে এবং মূল্যায়নকারীদের পরামর্শক্রমে চূড়ান্ত পর্যায়ে লেখাটি আরো ঋদ্ধ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত মোট ০৭(সাত) টি লেখার মধ্যে সূচিভুক্ত 'গণযোগাযোগ ও নিউ মিডিয়া সংস্কৃতি: একটি শিল্পতাত্ত্বিক পর্যালোচনা' শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধ বাংলাদেশের গণমাধ্যমের গতিধারা, গণযোগাযোগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিউ মিডিয়ার প্রসার, সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হয়েছে। 'চলনবিল অঞ্চলের জাগগান: একটি সমীক্ষা' নামধেয় দ্বিতীয় প্রবন্ধটি চলনবিল বিধৌত রাজশাহী-রংপুর অঞ্চলের বিলুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি-জাগগানের স্বরূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে। তৃতীয় প্রবন্ধ 'অস্তিত্বের সন্ধানে: টেস্ট অব চেরি' প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক আব্বাস কিয়ারোস্তমির মধ্যবয়সের ভাবনা ও জীবনদর্শন কীভাবে চলচ্চিত্রের ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, সেই বিশ্লেষণ রয়েছে লেখাটিতে। জার্নালের চতুর্থ লেখা: Role of Media for Strengthening Local Government in Bangladesh: A Qualitative Study. স্থানীয় সরকারগুলো যাতে যথাযথভাবে কাজ করতে পারে, সে লক্ষে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে সুসংহত করতে প্রবন্ধটিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। 'বাংলায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে কাঙ্গাল হরিনাথের অবদান: একটি প্রাথমিক পর্যালোচনা'– পঞ্চম এই প্রবন্ধে গ্রামীণ সাংবাদিকতার ধারাবাহিকতা ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যের অবতারণা করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ' নিয়ে সূচিভুক্ত ষষ্ঠ মননশীল প্রবন্ধ 'বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক বাংলা চলচ্চিত্র মুখ ও মুখোশ' শীর্ষক এই লেখাটিতে ১৯৪৭-উত্তর প্রতিকূল পরিবেশে নাট্যকর্মী ও প্রকৌশলী আব্দুল জব্বার খান কীভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ করলেন– সেই নির্মাণ প্রক্রিয়ার পূর্বাপর মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এবং সবশেষে, 'মমতাজউদদীন আহমদের নাট্যসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন' শীর্ষক সপ্তম প্রবন্ধে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধ প্রখ্যাত নাট্যকার মমতাজউদ্দীনের নাট্যসাহিত্যে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে, তার বৈশিষ্ট্য ও রূপ-রূপান্তর চিত্রিত হয়েছে।

পরিশেষে, 'জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল' ৭ম সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে যাঁরা শ্রম ও মেধা দিয়ে জার্নালের মান সমৃদ্ধ করতে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ঢাকা
মে, ২০২৪

ড. মো. মারুফ নাওয়াজ
পরিচালক (প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান)

সূচিপত্র

গণযোগাযোগ ও নিউ মিডিয়া সংস্কৃতি : একটি শিল্পতাত্ত্বিক পর্যালোচনা ১১
ড. ইসলাম শফিক

চলনবিল অঞ্চলের জাগগান : একটি সমীক্ষা ৩৯
ড. মো. আমিরুল ইসলাম

অস্তিত্বের সন্ধানে : টেস্ট অব চেরি ৬৭
কাজী সালমান শীশ

Role of Media for Strengthening Local Government in Bangladesh : A Qualitative Study ৮৩
Sayma Arju & Jamil Ahmed

বাংলায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে কাঙাল হরিনাথের অবদান: একটি প্রাথমিক পর্যালোচনা ১০৭
ওবায়দুল্লাহ্

ফিরে দেখা ১৩৩
বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক বাংলা চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ'
অনুপম হায়াৎ

মমতাজউদদীন আহমদের নাট্যসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন ১৪৫
মোরশেদুল আলম

গণযোগাযোগ ও নিউ মিডিয়া সংস্কৃতি : একটি শিল্পতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

ড. ইসলাম শফিক

মূল শব্দ (Keyword)

সংস্কৃতি, গণযোগাযোগ, গণমাধ্যম, প্রথাবদ্ধ মিডিয়া, নিউ মিডিয়া, নেটিজেন, ওটিটি

Abstract

Advances in science and information technology have led to massive changes in mass media. Globally there has been a rapid change in the field of mass communication. Modern technology has given the present time to the virtual world. The old traditional media is changing its form and transforming into the online medium. 'New Media' is consuming traditional media. Media works as one of the tools to deal with various problems of social life. With the need of time, print and electronic media are playing a role in positive changes in the society. Print media to radio, Radio to television, television to web media; This change is happening very fast. The Internet world has connected the whole world in a web; Which is called 'Global Village'. New Media is a new world! Our new another sky. To wander in the world of this medium, we have to walk with enough caution to catch the wings of thought in its sky. All that is indecent, unadorned and unbeautiful should be removed from the darkness, and the light of healthy culture and beauty should be embraced. In this context, the textual essay attempts to document Mass Communication and New Media Culture: An Artifact Review. A new medium, a new world. A world that teaches to imagine beyond imagination, and reality is a shadowy companion in the background. New-Media's new light has colored the world. The young generation is developing themselves as global citizens in the competitive global market by engaging with New Media.

New Media is another name for immense possibilities. But you have to know how to use it properly. Youth and the Internet can make the impossible possible. New Media will further change the dynamic world in future days. It will make the concept of global village more real, true and worthwhile. Everyone expects that New Media will play an important role in developing fair culture, practicing humanity, democracy, freedom of expression and protecting human rights. New Media will fill the world with Holy light. In the new world of this medium, the fan of thinking in the new sky must be met with enough caution. Discard the darkness and embrace the light. Efforts should be made to establish refined universal visual standards for online media to foster a sense of taste. New Media users have to undertake far-reaching plans to develop the visual and cultural tastes of the general public. Currently, healthy and pure culture is on the verge of disappearing due to the uncultured invasion of the online free market. The healthy culture is being swept away by the invasion of bad culture. In contrast to the arbitrariness of the ugly content that is currently going on in the online media of Bangladesh, initiatives should be taken to build a healthy culture and public taste. In this era of New Media renaissance, a large cultural movement must be built on the Internet. This cultural revolution has to be done through digital means in digital times. We have to build our own cultural and aesthetic standards on all platforms of New Media, containing the thousand-year tradition of Bengal and Bengalis, with the reflection of the great liberation war.

ভূমিকা

বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে গণমাধ্যমে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী দ্রুত পরিবর্তন এসেছে গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বর্তমান সময়কে ভার্চুয়াল দুনিয়ার হাতে তুলে দিয়েছে। পুরোনো প্রথাবদ্ধ গণমাধ্যম নিজের রূপ বদল করে অনলাইন মাধ্যমে রূপান্তরিত হচ্ছে। 'নিউ মিডিয়া' গ্রাস করে চলেছে প্রচলিত প্রথাবদ্ধ গণমাধ্যমগুলোকে। 'নিউ মিডিয়া'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ফরম্যাটের দিক থেকে ডিজিটাল আর প্রধান নির্ভরতা হলো ইন্টারনেট। যেমন- ফেসবুক, মেসেঞ্জার, ইনস্টাগ্রাম, এক্স-পূর্বতন টুইটার, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ, লিংকডইন, ভাইবার, পিন্টারেস্ট, টাম্বলার, ইমো, স্ন্যাপচ্যাট, উইচ্যাট, ব্লগ ও পডকাস্ট প্রভৃতি। Ronald E. Rice তাঁর *The New Media : Communication* গ্রন্থে প্রদত্ত 'নিউ মিডিয়া' সংজ্ঞা– New media are communication technologies that enable or enhance

interaction between users as well as interaction between users and content. প্রযুক্তির সুবিধা ও বিষয়বৈচিত্র্যের কারণে সাধারণ জনগণ প্রথাগত মিডিয়াকে পাশ কাটিয়ে 'নিউ মিডিয়া'র প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। New বা Neo উভয় উপসর্গ 'মিডিয়া' শব্দের আগে ব্যবহৃত হয়ে তৈরি হয় নব্যমাধ্যম Neo Media। 'Neo' শব্দের অর্থ হলো– নব্য বা আধুনিক, যা সাম্প্রতিক কালে তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমপরিবর্তনে একেবারে বদলে গিয়েছে গণমাধ্যমের পুরোনো চেহারা। সাম্প্রতিক কালে তৈরি হয়েছে নব্য-মিডিয়া বা Neo Media।

বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তি হলো— তথ্যপ্রযুক্তি ও গণযোগাযোগ সংস্কৃতি। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের, প্রতিটি সমাজেরই রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি। সংস্কৃতির কারণেই মানুষের ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন এবং জাতীয় জীবন অন্যদের থেকে স্বতন্ত্রতা লাভ করে। সাধারণ অর্থে সংস্কৃতি বলতে— কৃষ্টি, সংস্কার, বিশ্বাস ইত্যাদিকে বোঝানো হলেও সমাজবিজ্ঞানে এর আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। সংস্কৃতি হলো সেই জটিল সামগ্রিকতা, যাতে রয়েছে অন্তর্গত জ্ঞান, বিশ্বাস, নৈতিকতা, শিল্প, আইন, রাজনীতি, আচার, রীতিনীতি এবং সমাজের একজন সদস্য হিসেবে মানুষের দ্বারা অর্জিত অন্য যেকোনো সম্ভাব্য সামর্থ্য বা অভ্যাস। সমাজবিদ্যায় 'সংস্কৃতি' বলতে পূর্ণাঙ্গ জীবনধারাকে বোঝায়। বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে 'সংস্কৃতি' অর্থ লেখা হয়েছে— কৃষ্টি, চিৎপ্রকর্ষ, সংস্কার, শুদ্ধিকরণ, অনুশীলনে অর্জিত জ্ঞান-বুদ্ধির উৎকর্ষ, সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ, Culture। সংস্কৃতিকে ইংরেজিতে বলা হয় Culture, আর Culture শব্দটি এসেছে ল্যাটিন Colere থেকে।[১] বাঙালির রয়েছে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, যা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীকে থেকে বাঙালিকে পৃথক করে চেনা যায়। তবে এই অঞ্চলে বিভিন্ন সময় ও পরিপ্রেক্ষিতে নানা জাতির আগমন ঘটেছে, এতে করে এদেশের সংস্কৃতিতে বিভিন্ন সময় বিজাতীয় সাংস্কৃতিক নানাবিধ উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটেছে। আবার কালে কালে বহির্বিশ্বের নানাবিধ সাংস্কৃতিক উপাদান দ্বারা সমৃদ্ধ ও প্রভাবিত হয়েছে। এই বহুমিশ্রণ সংস্কৃতির মূলে– পর্যায়ক্রমে বিদেশি শক্তির আগমন, আগ্রাসন, ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ অন্যতম প্রধান কারণ। দেশি-বিদেশি সাংস্কৃতিক উপাদান একীভূতকরণের ফলে 'বাঙালি সংস্কৃতি' একটি মিশ্রসংস্কৃতির মধ্য দিয়ে নিজস্ব রূপ লাভ করেছে। সংস্কৃতি মানুষের জীবনধারার

প্রতিফলন, মানবজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষের ভাষা, চিন্তা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধ্যানধারণা, আচার-ব্যবহার, মূল্যবোধ, রীতিনীতি, রুচি, ব্যবহার্য বস্তুগত উপাদানসমূহ এসবের সম্মিলিত প্রকাশ ভঙ্গিমাই সংস্কৃতি। আধুনিক সমাজ ও সংস্কৃতির একটি অপরিহার্য অংশ হলো 'গণমাধ্যম'। সমাজের উপরিকাঠামো, জনজীবন, জীবনসংস্কৃতি, অবকাঠামো কিংবা মানবীয় আচরণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে গণমাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণমানুষের তথ্য, শিক্ষা, বিনোদন, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, ন্যায়-অন্যায়সহ নানাধর্মী চাহিদা মেটায় গণমাধ্যম। গণমাধ্যম জনগণকে প্রভাবিত করে, বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করে এবং স্বপ্ন দেখায়। গণমানুষ তাদের যাপিত জীবনের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা পায় গণমাধ্যমের কাছ থেকে। সামাজিক জীবনের নানা সমস্যা মোকাবিলায় গণমাধ্যম অন্যতম টুলস্ হিসেবে কাজ করে। সময়ের প্রয়োজনে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে নানা বিষয়ে ভূমিকা রেখে চলেছে। মুদ্রণ মাধ্যম থেকে বেতার, বেতার থেকে টেলিভিশন, টেলিভিশন থেকে ওয়েবমাধ্যম; খুব দ্রুত ঘটছে এই বদল। ইন্টারনেট দুনিয়া সারা বিশ্বকে জালের বুননে সংযুক্ত করেছে; যাকে বলা হচ্ছে 'গ্লোবাল ভিলেজ'।[২]

বর্তমান বিশ্বে প্রায় ৫.১ বিলিয়ন মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে।[৩] ইন্টারনেট (Interconnected Network) অন্তর্জাল, যা কি না পৃথিবীজুড়ে বিস্তৃত নেটওয়ার্কের জালপরিধি। অসংখ্য নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত বিশ্বব্যাপী বৃহৎ কম্পিউটার নেটওয়ার্ককেই বলা হয় 'ইন্টারনেট'। ইতোমধ্যে প্রায় চারশ কোটির অধিক মানুষ ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার অর্থাৎ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত। এই সংযুক্তির হার প্রতিবছর ৯% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইন্টারনেট সক্রিয়ভাবে ব্যবহারকারী মানুষদেরকে বলা হয় নেটিজেন (Netizen)। ইংরেজি Netizen শব্দটি গঠিত হয়েছে– Internet এবং Citizen এই দুইটি শব্দের সমন্বয়ে। Netizen- এর বাংলায় অনুবাদ করলে তার অর্থ হবে ইন্টারনেট দুনিয়ার নাগরিক বা 'নেট নাগরিক'।

এক গবেষণা সমীক্ষা থেকে জানা যায়— নেটিজেন বা নেট নাগরিকেরা দিনে গড়ে প্রায় ১৪৪ মিনিট ব্যয় করেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ইউটিউবে প্রতি মিনিটে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও কনটেন্ট আপলোড করা হয় প্রায় ৩০০ ঘণ্টার মতো।[৪] তথ্য, বিনোদন, বিজ্ঞাপন, ই-কমার্স, ই-বিজনেস, ই-মার্কেটিং, ই-শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাবৎ বিশ্বের প্রায় ৪১% ইন্টারনেট ব্যবহারকারী আজ 'নিউ মিডিয়া'র ওপর নির্ভরশীল। বিশ্বব্যাপী অনলাইননির্ভর তথ্য ও বিনোদনের

জয়জয়কার। বাংলাদেশেও বিস্ময়করভাবে বেড়েছে 'নিউ মিডিয়া' ব্যবহারকারী। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়— বাংলাদেশের প্রায় ৯৭ শতাংশ এলাকা মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে। মোবাইল সিমের গ্রাহকসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি অতিক্রম করেছে। ইন্টারনেট গ্রাহকসংখ্যা প্রায় সাড়ে ১২ কোটি ৭৫ লাখের কিছু বেশি।[৫] বিশ্বের মোবাইল অপারেটরদের সংগঠন গ্লোবাল সিস্টেম ফর মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের (জিএসএম) সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে থেকে জানা গেছে– বিশ্বে বর্তমানে একক মোবাইল সংযোগসংখ্যা ৪৯২ কোটি; এর মধ্যে ৫০ শতাংশ সংযোগ স্মার্টফোনে। ২০২৫ সালের শেষে এটি বেড়ে দাঁড়াবে ৭৬ শতাংশে। এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে স্মার্টফোন ব্যবহারকারী হবে ৭৬ শতাংশ। ফলে ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ বাংলাদেশ স্মার্টফোন ব্যবহারে শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে ৬ নম্বরে উঠে আসবে। বাংলাদেশে ২০২২ সালের শুরুতে নিউ মিডিয়া ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৫০ লাখ, তন্মধ্যে প্রায় ৯৮ শতাংশ স্মার্টফোনে ব্যবহার করেন।[৬]

বিশ্বজগৎ আজ উন্মুক্ত

অন্তর্জালের দুনিয়ায় বিশ্বের সকল দুয়ার আজ খোলা। খোলা দুনিয়ার অন্তর্জাল তথ্য ও বিনোদনজগতে এক নতুন অধ্যায় সূচনা করেছে। যাকে বলা হয় এই ওয়েব দুনিয়া। টেকনোলজি খুব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে; সম্প্রচার প্রযুক্তিতে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন মাধ্যম। টেকনোলজির বিকাশে মানুষের অভ্যাসে আসছে পরিবর্তন। নতুন প্রজন্ম নিউ মিডিয়া জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। বর্তমান সময়ে একজন মানুষের কাছে ইন্টারনেটসমেত একটি স্মার্টফোন হাতে থাকা মানে হাজারো কর্মকাণ্ড তার হাতের মুঠোয় চলে আসা। তরুণ প্রজন্ম এখন বইপড়া, গান শোনা, থিয়েটার দেখা, পত্রিকা-ম্যাগাজিন পড়া, রেডিও শোনা, টিভি দেখা সবই করছে অনলাইনে বা স্মার্টফোনে। ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, ভ্লগ, ব্লগ প্রভৃতি সমসাময়িক কালের সবচেয়ে আধুনিক ও জনপ্রিয় মিডিয়া। খবর, নাটক, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্র, খেলাধুলা, রান্নাবান্নার অনুষ্ঠান যখন যা চাই, পাওয়া যাচ্ছে 'নিউ মিডিয়া' শাখা-প্রশাখায়। অর্থাৎ 'নিউ মিডিয়া' গ্রাস করে চলেছে প্রচলিত গণমাধ্যমকে!

'অনলাইন প্ল্যাটফর্ম' ও 'নিউ মিডিয়া' অধুনা এই শব্দগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। কোভিড-১৯ মহামারিকালে ইন্টারনেটের ব্যবহার বেড়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ, ই-কমার্সে কেনাকাটা বেড়েছে প্রায় ৫০ শতাংশ।[৭] পরিবর্তিত এই অনলাইনভিত্তিক জীবনব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে সাধারণ মানুষ। আগামী সময়ে যেখান থেকে পিছিয়ে আসার আর সুযোগ থাকছে না। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাচ্ছে চলচ্চিত্র, প্রামাণ্যচিত্র, ধারাবাহিক নাটক, মিউজিক ভিডিও, ই-বুক প্রভৃতি। প্রতিদিন হাজার হাজার ইউটিউবার আপলোড করছে নতুন নতুন কনটেন্ট। Over The Top বা ওটিটি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অডিও-ভিডিওসহ নানা কনটেন্ট প্রচার বাড়ছে পৃথিবীব্যাপী। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বিস্তার ঘটেছে এবং ভীষণভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ওটিটি মাধ্যম। 'নিউ মিডিয়া'র দ্বিমুখী যোগাযোগের প্রযুক্তিগত সুবিধা কাজে লাগিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার কনটেন্ট সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে (Livestreaming)। তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষের ফলে মানুষের জীবনসংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্পসাহিত্য, গণমাধ্যম সবকিছুই যেন চলে গেছে নিউ মিডিয়ার দখলে। এই নির্ভরশীলতার মূলে রয়েছে নিউ মিডিয়ার যোগাযোগের অমিত শক্তি।

'নিউ মিডিয়া'র যোগাযোগের শক্তি আরও প্রবল হয়ে ওঠে কনটেন্ট বা বিষয়বস্তুর কারণে। বিষয়বস্তু প্রচার বা প্রকাশের জন্য প্রয়োজন মাল্টিমিডিয়ার সুষ্ঠু ব্যবহার। অর্থাৎ লিপি, শব্দ, চিত্র, অ্যানিমেশন, অডিও-ভিডিও প্রভৃতির নান্দনিক ব্যবহার ভীষণভাবে গুরুত্ব বহন করে। নিউ মিডিয়ার কনটেন্ট নির্মাণ ও প্রচারের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত কোনো মানদণ্ড নির্ধারণ করা নেই। যে যার ইচ্ছে মতন কনটেন্ট নির্মাণ করছেন। এসবের কিছু কনটেন্ট মানসম্মত, তবে বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়ন থেকে জানা যায়– অধিকাংশ কনটেন্টই মানহীন, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কুরুচিপূর্ণ। যার ফলে অনলাইনে প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হচ্ছে অসংগত ও অনান্দনিক কনটেন্টের ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনা। এসব কদর্য ভিজ্যুয়াল সংস্পর্শে মনন গঠন হচ্ছে বর্তমান প্রজন্মের। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের রাশ টানতে হবে এখনই। ভিজ্যুয়াল সাংস্কৃতিক রুচি বিনির্মাণে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে। রুচিশীল মনন গঠনে বাংলা ও বাঙালির হাজার বছরের চিরায়ত ঐতিহ্য, মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐশ্বর্য, দেশকাল, ভূগোল, মাটি-মানুষ ও প্রকৃতিকে ধারণ করে বিনির্মাণ করতে হবে আমাদের সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক একটি ভিজ্যুয়াল মানদণ্ড। নিউ মিডিয়া এক নতুন জগৎ! আমাদের নতুন আরেক

আকাশ। এই মাধ্যমটির জগতে বিচরণ করতে, এর আকাশে ভাবনার পাখা মেলতে আমাদেরকে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে পথ চলতে হবে। যা কিছু অশোভন, অমার্জিত ও অসুন্দর সেসব অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে, সুস্থ সংস্কৃতিচর্চা ও নন্দনের আলোটুকু গ্রহণ করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি রচনার প্রয়াস– *গণযোগাযোগ ও নিউ মিডিয়া সংস্কৃতি : একটি শিল্পতাত্ত্বিক পর্যালোচনা*।

নিউ মিডিয়ার জন্মকথা

নতুন মাধ্যম, নতুন এক দুনিয়া। যে জগৎ কল্পনার বাইরেও কল্পনা করতে শেখায়, আর বাস্তবতা ধাবমান থাকে পশ্চাতে ছায়াসঙ্গী হয়ে। নিউ মিডিয়ার নতুন আলোকচ্ছটা ভুবনকে রাঙিয়ে দিয়েছে। *'যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে'*– কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৭ সালে লেখা *'অন্তর মম বিকশিত করো'* কবিতায় এই মন্ত্রণা দিয়েছেন।[৮] বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের উন্মেষকালে উপনীত হয়ে অর্থাৎ কাব্যরচনার ১১৫ বছর পরও প্রযুক্তিনির্ভর যাপিত জীবনেও আলোচ্য কবিতার উল্লিখিত চরণখানি কতটা প্রাসঙ্গিক হয়ে আমাদের সংস্কৃতির সাথে মিশে আছে, তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়! পুরাতন বা প্রথাবদ্ধ গণমাধ্যমের পাশাপাশি নতুন ধারার যে গণমাধ্যমের পথচলা শুরু হয়েছে এরই নাম 'নিউ মিডিয়া'। বাংলায় 'নয়া মাধ্যম' হিসেবে পরিভাষায় অভিহিত করার প্রচেষ্টা চলছে। মূলধারার প্রধান গণমাধ্যমগুলো হলো– সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন ও অনলাইন পোর্টাল। এসব মাধ্যম ব্যতীত অন্য যে মাধ্যমগুলো থেকে তথ্য ও বিনোদন মিলছে সেগুলোই হলো 'নিউ মিডিয়া'। 'নিউ মিডিয়া'কে হাল আমলে 'বিকল্প গণমাধ্যম' অভিধাতেও অভিহিত করার প্রচেষ্টা চলছে। 'নিউ মিডিয়া' কী? এবং কাকে বলে নিউ মিডিয়া? এসবের সহজ উত্তর হলো– সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং ইন্টারনেট বা অনলাইনভিত্তিক যোগাযোগ পরিসরই হলো 'নিউ মিডিয়া'। নোয়া ওয়ারদ্রীপ ফ্রুইন ও নিক রিও মনফর্‌ট সম্পাদিত *The New Media Reader* গ্রন্থে নিউ মিডিয়ার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন– 'A form of mass communication using digital technologies, that is, any internet-related form of communication such as newspaper articles and blogs, music and podcasts, website or email, and streaming apps.'।[৯] নিউ মিডিয়াতে কাজ করা হয় ইন্টারনেট ব্যবহার করে। সেই কারণেই কোনো মাধ্যমকে নিউ মিডিয়া বলতে হলে প্রথমেই বিবেচনায় আনা হয় এর ইন্টারনেট সংযুক্তির বিষয়টি। এটিই হলো নিউ মিডিয়ার প্রধান শর্ত বা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষে বদলে যাচ্ছে গণমাধ্যমের চেনা চেহারা। যোগ হচ্ছে নতুন

নতুন বিষয়। ফেসবুক ও টুইটার হালের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বেশি ব্যবহৃত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম।

বিশ্বব্যাপী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোর যাত্রা অনেক আগে থেকে শুরু হলেও বাস্তবিক অর্থে ২০১০ সালে পৃথিবীজুড়ে ব্যাপকভাবে প্রকাশ ঘটে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এই অবস্থানে আসার নেপথ্যে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। ১৯৫০ সালে ইন্টারনেট আবিষ্কারের পর সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ধারণাটি মানুষের চিন্তার মধ্যে আসে। প্রাচীন যুগে মানুষ দূরবর্তী স্থানের কারো সাথে তথ্য ও ভাবের আদান-প্রদানের জন্য মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতেন দূত ও চিঠিপত্র। এ ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা ছিল অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। মূলত চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, টেলিফোনে তথ্য আদান-প্রদানের ধারণা থেকেই হালআমলের আধুনিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আবির্ভাব। অনলাইনভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের টুলসগুলোর উদ্ভাবনের ইতিহাসের দিকে পর্যায়ক্রমিক দৃষ্টি দেওয়া যাক। বর্তমান সোশ্যাল মিডিয়ার আবির্ভাবের শুরুটা হয়েছিল ই-মেইল আদান-প্রদানের মাধ্যমে। আমেরিকান কম্পিউটার প্রোগ্রামার Raz Tomlinson ১৯৭১ সালে প্রথম পরীক্ষামূলক ই-মেইল প্রেরণ করেন।[১০] অনেকেই ধারণা করেন যে, প্রথম পরীক্ষামূলক ই-মেইল প্রেরণের মাধ্যমেই আজকের এই সোশ্যাল মিডিয়ার আবির্ভাবের বীজ রোপিত হয়েছিল। Raz Tomlinson এরপর Eric Thomas নামে আরেকজন কম্পিউটার প্রোগ্রামার ই-মেইল আদান-প্রদানের জন্য একটি সফটওয়্যার উদ্ভাবন করেন; নামকরণ করেন Listserv। এই সফটওয়্যারটির বিশেষত্ব ছিল– একটি ই-মেইল পাঠালেই নির্দিষ্টসংখ্যক ব্যবহারকারীর কাছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই ই-মেইলের মেসেজ চলে যেত। ই-মেইল আবিষ্কারের পরেই মূলত চ্যাটিং- এর উদ্ভাবন হয়। Jarkko Oikarinen নামের একজন কম্পিউটার প্রোগ্রামার ১৯৮৮ সালে প্রথম Internet Relaz Chat নামে একটি চ্যাটিং সফটওয়্যার উদ্ভাবন করেন।[১১] ইন্টারনেট রিলে কথোপকথনের মাধ্যমেই মূলত আজকের আধুনিক চ্যাটিং বৈশিষ্ট্যের যাত্রা শুরু হয়েছিল।

১৯৯৬ সালে প্রথম সোশ্যাল মিডিয়া সাইটের যাত্রা শুরু হয়। প্রথম সোশ্যাল মিডিয়া সাইটের নাম হচ্ছে Sixdegrees.com।[১২] এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই মূলত সোশ্যাল মিডিয়া সাইটের যাত্রা শুরু হয়। Andrew Weinreich নামের একজন আমেরিকান এই ওয়েবসাইটটি তৈরি করেছিলেন। Sixdegrees.com ওয়েবসাইটটিতে দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল : প্রোফাইল তৈরি ও বন্ধুতালিকা তৈরি, Six

degrees এরপর আসে Friendster নামের আর একটি সোশ্যাল মিডিয়া ওয়েবসাইট ২০০২ সালে। লিংকডইন (LinkedIn) প্রতিষ্ঠিত হয় ৫ মে ২০০৩ সালে।[১৩] পেশাদার ব্যক্তিবর্গের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম হিসেবে জনপ্রিয়তার ধারাবাহিকতায় লিংকডইন প্রথম ভার্চুয়াল জগতে আসে। অনলাইন নির্ভর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মকে পেশাদারি এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রমে রূপ দিতেই মূলত LinkedIn- এর যাত্রা শুরু হয়। লিংকডইনের প্রায় এক বছর পর জনপ্রিয়তার ধারাবাহিকতায় Facebook ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ভার্চুয়াল জগতে আসে। মার্ক জাকারবাগ (Mark Zuckerberg) ও তাঁর সহপাঠী এডুয়ার্ডো স্যাভেরিন (Eduardo Saverin), এন্ড্রু ম্যাককালাম (Andrew McCollum), ডাস্টিন মস্কোভিটজ (Dustin Moskovitz), এবং ক্রিস হিউজেস (Chris Hughes) এই চার বন্ধু ফেসবুক তৈরির প্রক্রিয়ার নেপথ্যের মূল কারিগর। ফেসবুক সর্বপ্রথম শুরু হয়েছিল 'faceMash' নামে, ২৮ অক্টোবর ২০০৩ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২০০৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি নাম পরিবর্তন করে 'facebook' নামকরণ করা হয়।[১৪] সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম হিসেবে 'ফেসবুক' পৃথিবীব্যাপী ২০০৬ সালে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ইউটিউব হচ্ছে আমেরিকান জনপ্রিয় একটি অনলাইন ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম। এই ওয়েবসাইটে সাধারণ মানুষ তার পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ের ওপর ভিডিও দেখতে পারেন এবং নিজে ভিডিও তৈরি করে তাতে আপলোড করতে পারেন।

জায়ান্ট সার্চ ইঞ্জিন 'গুগল'- এর পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম সার্চ ইঞ্জিন 'ইউটিউব' (YouTube) বিশ্বসভ্যতাকে এগিয়ে দিয়েছে কয়েক ধাপ সামনে। চড হারলি (Chad Hurley), স্টিভ চেন (Steve Chen) এবং জাওয়াদ করিম (Jawed Karim) যৌথভাবে ইউটিউব প্রতিষ্ঠা করেন ২০০৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি।[১৫] বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জাওয়াদ করিম যুক্ত রয়েছেন ইউটিউব প্রতিষ্ঠার সাথে। ২০০৫ সালের ২৩ এপ্রিল তিনিই সর্বপ্রথম ইউটিউবে 'Me at the zoo' শিরোনামে ভিডিও আপলোড করেন। ১৯ সেকেন্ডের এই ভিডিওটিতে জাওয়াদ করিম 'স্যান ডিয়েগো চিড়িয়াখানা' হাতিশালার সামনে দাঁড়িয়ে হাতি দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন। সেই ভিডিও তুমুল সাড়া পায়। শুরু হয় ভিডিও কনটেন্টের নয়া দুনিয়া। ভিসিপি, ভিসিআর, ডিশলাইন, সিডি, ডিভিডি এসব নানান ভিডিও প্রযুক্তির পর অতিদ্রুত ইউটিউব জনপ্রিয়তা লাভ করে। সময়ের চাহিদায় এই মাধ্যমটিই হয়ে উঠল মানুষের তথ্য ও বিনোদনের অন্যতম উৎস।

সংবাদ, গান, নাচ, সিনেমা, নাটক, থিয়েটার, টক শো, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, ডেইলি সোপ– সব চলে এলো ইউটিউবে। সিরিয়াস গণমাধ্যম এবং বিনোদন সবই এখন 'এক ঘাটের জল'। ইউটিউব এখন পেশাদার আয়ের অন্যতম প্ল্যাটফর্ম। ইউটিউব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মূলত ভিডিও কন্টেন্ট নির্মাতাদের জন্য ইউটিউব পেমেন্ট পদ্ধতি রেখেছে। ইউটিউব তাদের বিজ্ঞাপন আয় থেকে ভিডিও কন্টেন্ট নির্মাতাদের অর্থ পরিশোধ করে থাকে। বাংলাদেশে 'ইউটিউবার'- এর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।

সোশ্যাল মিডিয়া সাইটগুলোর থেকে ভিন্নধর্মী ফিচার এনে নজরে আসে টুইটার (Twitter)। এটি বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ওয়েবসাইটগুলোর মধ্যে অধিক মার্জিত। টুইটারের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০০৬ সালের মার্চ মাসের ২১ তারিখ। এটির প্রতিষ্ঠাতা Jack Dorsez, Evan Williams, Biz Stone, Noah Glass। টুইটারের হেড অফিস San Francisco, California, United States।[১৬] টুইটারের মাসে বর্তমান সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ৩৩০ মিলিয়ন। অন্যান্য শুধু ১৪০ অক্ষরের মাঝে বার্তা পোস্ট করার ফিচারের জন্য জনপ্রিয়তা পায় এটি। সেলিব্রেটিদের মাঝে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম হিসেবে টুইটারের গ্রহণযোগ্যতা বেশি। টুইটারের মালিকানা বদল হয়েছে। স্পেসএক্স-এর সিইও ইলন মাস্ক টুইটার অধিগ্রহণ করেন। মালিকানা বদলের পর ২৪ জুলাই ২০২৩ সালে বদলে যায় টুইটারের লোগো। অতি পরিচিত নীল পাখির বদলে টুইটারের লোগো এখন 'X'। টুইটারের ২ বছর পরে তাৎক্ষণিক মেসেজিং করার জন্য জনপ্রিয় অ্যাপ (WhatsApp) হোয়াটসঅ্যাপের আগমন ঘটে ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৪ তারিখ।[১৭] হোয়াটসঅ্যাপের সদর দপ্তর মাউন্টেইন ভিউ, ক্যালিফোর্নিয়া যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত। WhatsApp জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম কারণ হলো এটি ব্যবহারকারীবান্ধব ও বিজ্ঞাপনমুক্ত।

বর্তমান বিশ্বে হাজার হাজার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওয়েবসাইট রয়েছে। নতুন নতুন ফিচার নিয়ে নতুন নতুন সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট তৈরি হচ্ছে। বর্তমান প্রজন্মের মানুষেরা এসব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সম্পৃক্ত হয়ে বিভিন্ন সোশ্যাল কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি নিজের ব্যবসায়ের প্রচার ও প্রসার ঘটাচ্ছে। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী। দিন দিন প্রযুক্তি যেমন উন্নতি হচ্ছে, ঠিক তেমনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন Artificial intelligence (AI) অনেক বৈশিষ্ট্য সোশ্যাল মিডিয়ার শাখা-প্রশাখায় যুক্ত হচ্ছে।

যা শিগগিরই ব্যবহারকারীকে অন্যমাত্রার অভিজ্ঞতায় ভ্রমণ করাবে! বলা যেতে পারে– নিউ মিডিয়া আবির্ভাবের ফলে তীব্র সংকট ও টিকে থাকার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে মূলধারার গণমাধ্যম।

বিশ্বজগৎ দেখব আমি

নিউ মিডিয়া স্থানিক দূরত্ব ও শারীরিক উপস্থিতির ব্যবধানকে ঘুচিয়ে দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ফলে উন্নত দেশের একজন তরুণের মনোজগতের সঙ্গে স্থানীয় একজন তরুণের চিন্তা ও ভাবনার পার্থক্য অনেকটাই কমে এসেছে। বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কার, উদ্ভাবন, নানা রকম তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে প্রায় একই সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে তরুণেরা। নতুন প্রজন্মের মধ্যে যোগাযোগটাও সহজ করে দিয়েছে নিউ মিডিয়া। বদলে গেছে মানুষের তথ্য চাহিদার ধরন। সময়ের খবর এখন সবাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চাই। এই চাহিদার দাবি নিউ মিডিয়া খুব ভালোভাবেই মেটাতে পারছে। সেই কারণেই নিউ মিডিয়ার প্রতি সবাই আকৃষ্ট হচ্ছে। দৈনন্দিন জীবনে এর প্রতি মানুষের নির্ভরশীলতা বহুগুণ বেড়ে যাচ্ছে। যুগের পরিবর্তন একেবারে বদলে দিয়েছে মিডিয়ার চালচিত্র। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে মিডিয়ার আকৃতি ও প্রকৃতিতে পরিবর্তন এসেছে। মুদ্রণ কাগজ অনলাইনে পরিবর্তিত হয়েছে, রেডিও-টিভি বাক্সের খোলস থেকে এখন চলে এসেছে একেবারে হাতের মুঠোয়। এ এক ভিন্ন জগৎ! যে জগতে কল্পনা আর বাস্তব হাত ধরাধরি করে চলে। যেখানে রয়েছে ইচ্ছে পূরণের অপার স্বাধীনতা! ভাবনারা যেখানে ইচ্ছেমতো পাখনা মেলতে পারে। আগ্রহী যে কেউ এখানে নিজের ডানায় উড়তে পারেন। আগে যারা শ্রোতা, দর্শক কিংবা পাঠক ছিলেন, প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারাই এখন কবি-সাহিত্যিক, লেখক, কথক, টক শো আলোচক, সাংবাদিক, অভিনেতা, নির্মাতা অর্থাৎ আপনি যা চান– তাই করতে পারবেন। নিউ মিডিয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য যে বিষয়টা ছিল তা হলো– স্বাধীনতা। নিউ মিডিয়ার কারণে মানুষ এখন নিজেরাই তাদের বিষয় নির্ধারণ করে নেন। ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এই টুলসগুলো সেই স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। নিজেদের প্রয়োজন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রচারে তারা আর এখন মূলধারার গণমাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল নয়। যে কেউ চাইলেই নিউ মিডিয়ায় সরাসরি নিজের মতামত, ছবি বা কোনো সংবাদ প্রচার করতে পারে। নিউ মিডিয়ার অন্যতম সুবিধা হচ্ছে পারস্পরিক যোগাযোগ ও অংশগ্রহণের সুযোগ। আগে মূলধারার গণমাধ্যমে

সাধারণ মানুষ অর্থাৎ পাঠক-দর্শক-শ্রোতাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ তেমন ছিল না। নিউ মিডিয়া সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। ফেসবুক, টুইটার ও ইউটিউবে সাধারণ মানুষ নিজেদের আধেয় যখন-তখন প্রকাশ করতে পাচ্ছে। যখন যা চাই, যে কোনো বিষয়ে নিউ মিডিয়ায় তা দেখা, পড়া বা শোনার সুযোগ তৈরি হয়েছে। কবি কাজী নজরুল ইসলাম *'সংকল্প'* কবিতায় 'বিশ্ব-জগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে'– যে সংকল্পের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন, তা নিউ মিডিয়া ব্যবহার করে এখন ধ্রুব সত্যরূপে বাস্তবিকভাবে সম্ভব হয়েছে।[১৮] বিকল্প গণমাধ্যম নিউ মিডিয়ার ব্যাপ্তি এখন সমাজের অনেক গভীরে পৌঁছে গেছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম নিউ মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রতিযোগিতার বিশ্ববাজারে নিজেদেরকে বিশ্বনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলছে।

নিউ মিডিয়া সংস্কৃতি

নিউ মিডিয়ার দ্বার সবসময় খোলা, অবারিত। আগ্রহী যে কেউ এখানে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারেন। প্রথাবদ্ধ মিডিয়ার স্বর্ণসময়ে আগে যারা শ্রোতা, দর্শক কিংবা পাঠক ছিলেন, তাদেরকে উপায়হীন অত্যাবশ্যকীয়ভাবে সেসব গণমাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হতো। বলা চলে মানুষ নির্ভর থাকতে অনেকটা বাধ্যই ছিল, কিন্তু এখন চিত্র ভিন্ন। নিউ মিডিয়ার কারণে মানুষ এখন নিজেরাই নিজেদের অ্যাজেন্ডা নির্ধারণ করে নেয়। ফেসবুক, টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তাদের সেই স্বাধীনতা চর্চা করার সুযোগ এনে দিয়েছে। নিজেদের প্রয়োজনে তথ্য পেতে বা প্রচার করতে এখন আর প্রচলিত গণমাধ্যমের ওপর এককভাবে নির্ভরশীল থাকতে হচ্ছে না। সাধারণ মানুষ যে কেউ চাইলে, যেকোনো সময় নিউ মিডিয়ার মাধ্যমে সরাসরি নিজের মতামত, কোনো তথ্য, ছবি, বিষয়, অডিও, ভিডিও বা কোনো খবর প্রচার করতে পারে। তরুণ প্রজন্ম নিউ মিডিয়ায় যুক্ত হয়ে নিজেদেরকে গড়ে তুলছে বিশ্বনাগরিক হিসেবে। এটা শুধু নগর বা শহরে নয়, নিউ মিডিয়ার বিস্তৃতি পৌঁছে গেছে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অজপাড়াগাঁয়েও। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর *রাজা* নাটকে 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে' এই গানে গণতান্ত্রিক মনোভাবের যে পরিস্ফুটন ঘটিয়েছেন, তা মত প্রকাশ ও চিন্তার স্বাধীনতার বন্দনা হিসেবে পাঠ করা হয়।[১৯] নিউ মিডিয়া সংস্কৃতিতে রয়েছে 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে' সেই অবাধ স্বাধীনতার সুষ্ঠু ব্যবহারের। রয়েছে নিজেকে প্রকাশের সুযোগ, রয়েছে নিজেকে আড়াল করারও সুযোগ। আমি যা নই তা দেখানোর সুযোগও রয়েছে। অনায়াসে আগেকার একটা ছবি দিয়ে আপনি সাময়িকভাবে

ফিরে পেতে পারেন ফেলে আসা অতীত কৈশোরের স্বর্ণসময়। নিজের বদনখানি সুন্দর দেখাতে ছবি সম্পাদনা করার সুযোগ রয়েছে। নিমেষেই দূরের কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায়। সমমনাদের সঙ্গে আলাপ করা যায়, নিজের আনন্দ-বেদনা ভাগাভাগি করা যায়। প্রয়োজনে বাড়িয়ে দেওয়া যায় সহযোগিতার হাত। পাল্টা প্রয়োজনে অন্যদের সহযোগিতাও মেলে। প্রাণ খুলে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করা যায়। ধারণকৃত স্থিরচিত্র, অডিও, ভিডিও খুব সহজেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মুহূর্তে প্রচার করা যায়। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, বর্ণ, শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য, খেলাধুলা, সিনেমা, থিয়েটার, উন্নয়ন, প্রতিবাদ, আলোচনা, সমালোচনা, তর্ক-কুতর্ক-প্রতর্ক বা বিতর্ক, কেনাকাটা, ব্যবসা-বাণিজ্য এখন এসবই করা যাচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কর্মসূচি, দাওয়াত ও ভেন্যু প্রসঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে নিউ মিডিয়ার মাধ্যমে। জন্মবার্ষিকী, বিবাহবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, জন্ম-মৃত্যু সংবাদ, শুভেচ্ছা, শুভকামনা, দোয়া কামনা সবকিছুর হাট বসে প্রতিদিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। নিউ মিডিয়ার এই অনলাইন হাট দিবারাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা খোলা।

নিউ মিডিয়া যোগাযোগ সংস্কৃতি চর্চা ও বিকাশের একটি নতুন ধারা। বর্তমানে ফেসবুকে বা ইউটিউবে অসংখ্যা কন্টেন্ট নির্মিত হচ্ছে। বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ ব্যক্তিগত মিডিয়া হিসেবে বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট আপলোড করে দেশ-বিদেশের অসংখ্য মানুষকে দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে। প্রযুক্তির কল্যাণে অজপাড়াগাঁ আর মহানগর বা বহির্বিশ্বের নামকরা শহরের মধ্যে আর ব্যবধান নেই বললেই চলে! সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক দূরত্ব হ্রাসে ভূমিকা রাখছে নিউ মিডিয়া। উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ নির্বিশেষে সবাইকেই একটি আপন জায়গা করে দিয়েছে। উচ্চবর্গের প্রকাশমাধ্যম হিসেবে শুরু থেকেই প্রচলিত গণমাধ্যমগুলো ছিল। কিন্তু সাধারণের কাছে নিজের একান্ত প্রয়োজনে ব্যবহারযোগ্য এই নিউ মিডিয়া একটি বড় প্রাপ্তি। ডিজিটাল সময়ে নিউ মিডিয়াই হয়ে উঠেছে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাহীনের মূল হাতিয়ার। সংস্কৃতির নতুন ক্ষেত্র ও ভাষা তৈরি হয়েছে, নতুন প্রকাশভঙ্গি নির্মাণ করে দিচ্ছে নিউ মিডিয়া। সংস্কৃতির নতুন বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা না করে উপায় নেই।

প্রচলিত মুদ্রণ সংবাদপত্র বর্তমান সময়ে প্রযুক্তির সঙ্গে ঠিক তাল মিলিয়ে উঠতে পারছে না। পাঠক ও গ্রাহকসংখ্যা দিন দিন কমছে। অনেকটা বাধ্য হয়েই প্রিন্ট

মিডিয়াকে নিজেদের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে যেতে হচ্ছে অনলাইন সংস্করণের দিকে। একসময় রেডিও ছিল সবার সবচেয়ে প্রিয় মাধ্যম। এখন রেডিওর শ্রোতা কমে গেছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে। বলতে গেলে এফএম ও কমিউনিটি রেডিও কোনো রকমে টিকিয়ে রেখেছে এই সম্প্রচার মাধ্যমটিকে। মানুষ এখন বই বা পত্রিকা পড়ছে, রেডিও শুনছে, টিভি দেখছে স্মার্টফোনে, ট্যাবে বা ল্যাপটবে। নির্দিষ্ট স্থানে বসে থেকে টিভি দেখার বাধ্যবাধকতা এখন আর নেই। যখন ইচ্ছে তখন, সেখানে খুশি সেখানে অবস্থান করেই রেডিও-টেলিভিশন শোনা ও দেখা যাচ্ছে। প্রযুক্তির এই পরিবর্তনে প্রচণ্ড ধাক্কা লেগেছে প্রথাবদ্ধ গণমাধ্যমে। প্রথাবদ্ধ গণমাধ্যম এখন নিজের টিকে থাকার জন্য অস্তিত্বের লড়াইয়ে নিয়ত যুদ্ধ করছে। বিনোদন দুনিয়ায় নতুন করে যোগ হয়েছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম। বলা হচ্ছে, এই প্ল্যাটফর্মই বিনোদনজগতের ভবিষ্যৎ। প্রশ্ন আসতে পারে ওটিটি আসলে কী? ওটিটি হচ্ছে একধরনের স্ট্রিমিং মিডিয়া পরিষেবা যা, দর্শকদের কাছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরাসরি সরবরাহ করা হয়। OTT-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Over The Top।[২০] এই প্ল্যাটফর্ম হলো মূলত বিভিন্ন ওয়েবসাইট, যেসব সাইট আমাদেরকে ভিডিও স্ট্রিমিংয়ের সুবিধা প্রদান করে। ওটিটি প্ল্যাটফর্মে বহু ধরনের কনটেন্ট রয়েছে, যখন যার যেটা দেখা প্রয়োজন, সে তার চাহিদা অনুযায়ী দেখতে পায়। ওটিটি প্ল্যাটফর্মে অন্যতম জনপ্রিয় উপস্থাপন শাখা হলো 'ওয়েব সিরিজ'। বাংলাদেশের বাইরে অন্য দেশগুলোতে আগে থেকেই এই প্ল্যাটফর্ম প্রচলিত রয়েছে। যার মধ্যে কিছু জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে– নেটফ্লিক্স (Netflix), অ্যামাজন প্রাইম (Amazon Prime), বায়োস্কোপ (Bioscope), হৈ চৈ (Hoichoi) ইত্যাদি।[২১] যতই দিন যাচ্ছে সারা পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশও ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোর প্রসার বেড়েই চলেছে। ক্রমবর্ধমান ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সব ধরনের প্ল্যাটফর্মই রয়েছে। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দর্শক ঘরে বসেই অনলাইনে অনুষ্ঠান দেখতে পারেন।

নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইমের মতো বিশ্বনন্দিত প্ল্যাটফর্মগুলো বাংলাদেশের বাজারের বিশাল একটি অংশ দখল করে রেখেছে। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে নিজস্ব উদ্যোগে বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকটি প্ল্যাটফর্ম চালু হয়েছে এবং বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে বায়োস্কোপ (Bioscope), হৈ চৈ (Hoichoi), বঙ্গ (Bongo), চরকি (Chorki), বিঞ্জ (Binge), সিনেবাজ (Cinebaz), টফি (Toffe), আড্ডাবাজ (Addabaz) প্রভৃতি। প্রতিযোগিতার বাজারে বিভিন্ন ওটিটি

প্ল্যাটফর্মের আগমন দেশীয় দর্শকের রুচির পরিবর্তনকেই ইঙ্গিত করে। এ ছাড়া ভারতীয় কয়েকটি ওটিটি যেমন হইচই, জিফাইভ গ্লোবাল বাংলাদেশের জন্য আলাদাভাবে কনটেন্ট নির্মাণ করছে। ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকেই ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা যায়। সহজ ব্যবহার আর পর্যাপ্ত কনটেন্ট থাকায় প্রতিনিয়ত বাড়ছে ওটিটির জনপ্রিয়তা। দর্শকেরা সচেতন, তারা এখন মানসম্পন্ন কনটেন্ট দেখতে চায়। টিকে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত ভালো মানের কনটেন্ট তৈরি করছেন নির্মাতারা। আঞ্চলিক দর্শক টানতে বেশ সচেতন ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলো। অঞ্চল অনুযায়ী দর্শকের চাহিদা আর পছন্দকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে কনটেন্ট নির্মিত হচ্ছে। আঞ্চলিক মানুষের আয়ের ওপর নির্ভর করে তারা প্যাকেজ চালু করছে। স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের সাবস্ক্রিপশন প্যাকেজ তৈরি করে গ্রাহকের কাছে পৌঁছাচ্ছে প্ল্যাটফর্মগুলো। যদি সময়ের সঙ্গে কাজের মান বজায় রেখে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এগিয়ে যায়, তাহলে ভবিষ্যতে ওটিটি প্ল্যাটফর্মই বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিনোদন মাধ্যম হিসেবে অবস্থান করে নেবে।

ইমোজি সংস্কৃতি

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মানুষ নিজের মনের কথা বা বক্তব্য, হাবভাব, আবেগ, অনুভূতি বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করে। লেখ্যরূপ অধিক গুরুত্ব পেলেও ভিডিওর মাধ্যমে বাচিক উপস্থাপনাও বেশ জনপ্রিয়। হাল আমলে এসবকে লেখ্যরূপ বা কথ্যরূপকে পেছনে ফেলে সর্বাগ্রে জায়গা করে নিয়েছে ইমোটিকন ও ইমোজি। নেটদুনিয়ায় বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়াতে পছন্দ, ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা, হাসি, কান্না, দুঃখ, রাগ– এসব প্রকাশে এখন আর লাইনের পর লাইন শব্দ-বাক্য, কথা বর্ণনা ব্যবহার করছেন না। নানা রকমের ইমোটিকন ও ইমোজি ব্যবহার করেই খুব দ্রুত সময়ে নিজের মনের ভাব বা আবেগ প্রকাশ করার সংস্কৃতি চালু হয়েছে। কখনো কখনো একটি ইমোটিকন বা ইমোজির সঠিক ব্যবহার বহু শব্দে-বাক্যে গঠিত অনুভূতির চেয়েও অধিক শক্তিশালী হয়ে উঠছে। ইমোটিকন হচ্ছে টেক্সটভিত্তিক উপস্থাপনা, বিভিন্ন প্রকার আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের জন্য মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তির একপ্রকার টাইপোগ্রাফিক উপস্থাপনা। দীর্ঘ বাক্য এবং বর্ণনামূলক শব্দ ব্যবহার না করে অতিদ্রুত সংখ্যা আর বিরামচিহ্নের মাধ্যমে মুখচ্ছবিতে আবেগ প্রকাশের একটা প্রক্রিয়া। একাধিক অক্ষরের সংগঠন, যা নির্দিষ্ট কোনো একটি মনোভাব ফুটিয়ে তোলে। কিন্তু এটি কোনো শব্দ নয়;

বলা যেতে পারে অক্ষর দিয়ে তৈরি ছবি। ইমোটিকন ইতোমধ্যে যোগাযোগের প্রচলিত পদ্ধতি অতিক্রম করে নতুন সর্বজনীন ভাষা হয়ে উঠছে। ইমোটিকন (Emoticon) হলো দুটি শব্দের সমন্বয়ে তৈরি– আবেগ (emotion) এবং আইকন (icon)। পছন্দ, ভালোবাসা, আনন্দ, কৃতজ্ঞতা, দুঃখ-বেদনা, অভিমান, রাগ প্রভৃতি ভাব ও অনুভূতি ইমোটিকন দিয়েই সমাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যেকোনো লেখা বা ছবিতে আবেগ প্রকাশ করা যায়। এটি বিন্দু, ড্যাশ এবং অন্য গ্রাফিক চিহ্নগুলোর সাথে তৈরি ছবি, যা মেজাজের প্রতিনিধিত্ব করতে পাঠ্য বার্তায় ব্যবহৃত হয়। ইমোটিকন অনানুষ্ঠানিক ভাষার অংশ, তাই আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইমোটিকন ব্যবহার করা সমীচীন নয়। তবে নিত্যদিনের ব্যবহৃত ভাষায় ইমোটিকনের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এ ধরনের চিত্রভাষা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। *'অনেক কথা যাই যে বলি, কোন কথা না বলি'*– কবিগুরুর গানের ভাষার যথাযথ মর্মার্থ অনুধাবনে ইমোজি ও ইমোটিকনের ব্যবহার যেন প্রকৃষ্ট উদাহরণ!

ইমোজি (emoji) ও ইমোটিকন (emoticon)-এর কাজ একই হলেও শিল্পপ্রকরণে দুটি আলাদা বিষয়। ইমোটিকন (emoticon) হলো মুখভঙ্গির মাধ্যমে আবেগের প্রকাশ। আর ইমোজি (emoji) হলো অ্যানিমেটেড ডিজিটাল ইমেজ। ইমোজি (emoji) হলো ছোট ছোট কতগুলো আইকন। যা ডিজিটাল কমিউনিকেশন, SMS, ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। ইমোজি (emoji) শব্দটি এসেছে– জাপানি 'ই (e)' মানে ছবি (picture) ও 'মোজি (moji)' মানে আদল (Character) থেকে।[২২] সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের চ্যাটবক্সে, বিভিন্ন মেসেঞ্জার অ্যাপ বা ওয়েবসাইটে এসব অ্যানিমেটেড ডিজিটাল ইমেজ সংযুক্ত দেয়া থাকে, যা খুব সহজেই ব্যবহার করা যায়। জাপানি সিজেতাকা কুরিতা (Shigetaka Kurita) হলেন ইমোজির জনক।[২৩] ইমোজি হলো ওয়েবে ব্যবহৃত গ্রাফিক্যাল উপস্থাপনার ভাবলিপি বার্তা। গত শতকের নব্বইয়ের দশকে জাপানি মোবাইল ফোনে ইমোজির প্রথম আবির্ভাব ঘটে। এরপর অ্যাপলের আইফোনে ইমোজি অন্তর্ভুক্ত হবার সাথে সাথে ইমোজির বিশ্বজয় শুরু হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ১৭ জুলাই এখন 'বিশ্ব ইমোজি দিবস' পালিত হচ্ছে; ২০১৪ সালে দিবসটি প্রথম পালিত হয়।[২৪] ভার্চুয়াল দুনিয়ায় আবেগ প্রকাশের জন্য ইমোজি যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যমে হিসেবে পরিণত হয়েছে। এখন আর খুশির অনুভূতি লিখে পাঠাতে হয় না। একটিমাত্র চিত্রই গ্রাহককে প্রিয়জনের সঙ্গে আবেগ প্রকাশের সুযোগ করে দিচ্ছে। নেট-দুনিয়ায়

বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়াতে পছন্দ, ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা, হাসি, কান্না, দুঃখ আর রাগ; নানা রকমের ইমোজি ব্যবহার করেই নিজের আবেগ প্রকাশ করা যায়। কখনো কখনো একটি ইমোজির ব্যবহার কয়েক পৃষ্ঠা লেখ্য বক্তব্যের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে!

হাল আমলে মানুষের ভাব প্রকাশও সহজ থেকে সহজতর হয়ে গেছে। নিউ মিডিয়ার প্রতিটি মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের ইমোজি ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে। আজকাল ভাবপ্রকাশে একটা বাক্য বা কয়েকটি শব্দ লেখার সময় মানুষের হাতে নেই! পৃথিবী গতিময়, সেই গতির সঙ্গে তাল মেলাতে মানুষ আরও গতিময় হচ্ছে; খুঁজে নিচ্ছে সোজা, সহজ ও সংক্ষিপ্ত পন্থা। তাই লেখালেখিতে লম্বা সময় ব্যয় করার পরিবর্তে ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে নানা ধরনের ইমোজি ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরের এই ইমোজি আমাদের হয়তো সময় বাঁচিয়ে দিচ্ছে! কিন্তু অপ্রিয় বাস্তব সত্য, কেড়ে নিচ্ছে আবেগ প্রকাশের চিন্তাশক্তিকে! এই সংক্ষিপ্ত পন্থা অবলম্বনকারী মানসিকতার প্রভাবে বর্তমান সময়ে তৈরি হচ্ছে একটি 'ইমোজি প্রজন্ম'! যারা যাপিত জীবনে যান্ত্রিক এক রোবোটিক আবেগে স্নাত, অনেক ক্ষেত্রেই মানবিক আবেগ অনুপস্থিত! তবে এর বিপরীতে ইতিবাচক চিত্রও রয়েছে– বর্তমান সময়ে তরুণ প্রজন্মের কাছে ইমোজির ব্যবহার দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। প্রথাগত যোগাযোগের প্রচলিত পদ্ধতি অতিক্রম করে, ইমোজি সংস্কৃতি নতুন একধরনের সর্বজনীন ভাষা বিনির্মাণ করে চলেছে। *'নানান দেশের নানা ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা, পুরে কি আশা?'*[২৫] রামনিধি গুপ্তের এই কবিতাংশ কেবল আমাদের নয়, বিশ্বের প্রতিটি মাতৃভাষাভাষী মানুষের কাছেই ধ্রুব সত্য! কিন্তু হাল আমলের প্রযুক্তির দাপটের পরিবর্তিত দুনিয়ায় ইমোজি সংস্কৃতি ভাষা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশ্ববাসীকে এক কাতারে নিয়ে এসেছে, তৈরি করেছে নতুন একটি সংস্কৃতি বলয়। এখন স্বদেশি ভাষা ছাড়াও নেটিজেনরা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারছেন– একই ধরনের ইমোজির চিত্রভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম চিন্তাবিদ নোয়াম চমস্কি ভাষা প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত, 'ভাষা কোনো যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। ভাষা মানুষের সৃজনী চেতনার সঙ্গে যুক্ত।'[২৬] তাই বলা যায়, ভাষার এই ডিজিটাল রূপান্তর সময় ও প্রয়োজনের হাত ধরেই প্রতিনিয়ত অগ্রসর হচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, ডিজিটাল মার্কেটিং, পেশাদার-অপেশাদার প্রায় সব জায়গাতেই ইমোজির ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনলাইন বা ডিজিটাল প্রযুক্তির কালে ভাষামাধ্যমও ডিজিটালে রূপান্তরিত হয়েছে। আদিকালের ভাষাহীন মানুষ

যোগাযোগ করত– রেখা, চিত্র বা ছবি এঁকে। প্রযুক্তির উৎকর্ষে অত্যাধুনিক যোগাযোগব্যবস্থায় প্রাচীনকালের সেই রেখা, চিত্র বা ছবি ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে পুনরায় বহুল চর্চায় ফিরে এসেছে। ইন্টারনেটে দৈনন্দিন কথোপকথনে ইমোটিকন ও ইমোজি ব্যবহার না করার কথা বর্তমান প্রজন্ম চিন্তাও করতে পারবে না। ইমোজি হলো মানুষের অনুভূতি আর মুখভঙ্গির আদলে গড়া একধরনের ডিজিটাল আইকন। প্রযুক্তি ও সময়কে আত্মস্থ করে ভাষার এই নবরূপায়ণ ঘটেছে। এটিকে গ্রহণ না করে, অস্বীকার বা খারিজ করে দেবার কোনো সুযোগ নেই। বিশ্বসংস্কৃতির অংশ হিসেবে হাল আমলের নয়া ট্রেন্ডকে আমাদের গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। অনেকে আবার ইমোজির সঠিক অর্থ না জেনেই ব্যবহার করে থাকেন! এতে করে তৈরি হয় ভিন্ন বিপত্তি। আমাদের প্রত্যেকের ইমোটিকন বা ইমোজির সঠিক অর্থ জেনে ব্যবহার করা উচিত। ইমোজির ভুল ব্যবহারের কারণে আবেগের বিপরীত অর্থবোধক বার্তা চলে যেতে পারে! ভাষা আপন গতিতে নদীর ধারার মতো পরিবর্তিত হয়। ভাষার ব্যাপারটাই তো এমন; প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হবে, তবেই জীবিত থাকবে ভাষা। জীবিত ভাষা যোজন-বিয়োজনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। নতুন নতুন শব্দ ভাষাকে যেমন সমৃদ্ধ করে, তেমনি নতুন নতুন ডিজিটাল আইকন, চিত্রভাষা, ইমোজি, ইমোটিকন সৃজনের মধ্য দিয়ে অনলাইনের যোগাযোগভাষাও সমৃদ্ধ হচ্ছে। যার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো মনের ভাব প্রকাশ করা। গ্রহণ-বর্জনের সীমাবদ্ধতা থাকলে ভাষার উন্নতি হয় না। পরিবর্তন নিয়ে শক্ত অবস্থানে থাকলে ভাষাটা সেকেলেই থেকে যায়; একসময় ভাষার বিলুপ্তি ঘটে। এভাবে বহু ভাষা বিলুপ্ত হয়েছে। তরুণ প্রজন্মের মাঝে ইতোমধ্যে ইমোজি, ইমোটিকন, ডিজিটাল আইকন বা চিত্রভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে চেতনে-অবচেতনে এক নয়া-সংস্কৃতি চালু হয়েছে। বলা যেতে পারে যা প্রকারান্তরে যোগাযোগের আদি ভাষার আধুনিক রূপ! সমকালীন তরুণ প্রজন্ম ও আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সম্মিলিত মিথস্ক্রিয়ায় ইমোটিকন ও ইমোজি সংস্কৃতি সমগ্র বিশ্বকে একটি কমন আবেগ-অনুভূতির ভাবস্নাত হওয়ার যোগাযোগ মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছে।

নিউ মিডিয়ার ইতিবাচক প্রভাব

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও ডিজিটালাইজেশনের এ যুগে বিশ্ব আজ হাতের মুঠোয়। একবিংশ শতাব্দীর তথ্য ও যোগাযোগব্যবস্থায় নতুন ধারায় প্রবেশ করেছে গণযোগাযোগমাধ্যম। তথ্য, সংবাদ ও বিনোদন এখন মানুষের হাতের মুঠোয়।

বিশ্বব্যাপী নিউ মিডিয়া এখন শক্তিশালী, ক্ষমতাবান, মর্যাদাপূর্ণ সর্বাধুনিক গণমাধ্যম। শুধু সর্বাধুনিক প্রযুক্তির পাশাপাশি প্রথাবদ্ধ যোগাযোগমাধ্যমের অপূর্ণতাকে ঢেকে দিয়ে তার স্থান দখল করে নিচ্ছে নিউ মিডিয়া। ডিজিটাল মিডিয়া ব্যবহারকারীর সংখ্যা রীতিমতো হু হু করে বাড়ছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় পুরোটা জুড়েই আছে সামাজিক মাধ্যমের আনাগোনা। সকালে ঘুমজড়ানো চোখেই আমরা মোবাইলটা খুঁজে অনলাইনে চোখ বুলিয়ে নিই। যেকোনো মাধ্যমে বিদ্যমান গুরুত্বপূর্ণ বার্তাগুলোয় নজর দিই। আমাদের অনেকেরই দিনের শুরুটা স্মার্টফোনের পর্দায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঢুঁ মেরেই শুরু হয়। সামাজিক মাধ্যমকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য। খুলেছে ই-কমার্সের দুয়ার। নিউ মিডিয়াকে ঘিরেই গড়ে উঠছে নানা রকম শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, খেলাধুলা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভ্রমণ, রান্নাবান্না, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের অনুশীলন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক দিকসমূহ– পুরো পৃথিবী মানুষের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে; স্থানিক দূরত্বের ব্যবধান এখন আর কোনো বিষয় নয়; স্বাধীনভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করা যায় এবং অন্যের মতামত জানা যায়; পেশাদার সাইটগুলো থেকে চাকরি সন্ধানের সহায়তা; বিজ্ঞাপনের প্রচার ও প্রকাশের সুযোগ; আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন; ই-শিক্ষার মাধ্যমে ঘরে বসেই বিশ্বের খ্যাতিমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাসেবা গ্রহণ করা; অনলাইনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে ই-কমার্সের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা; টেলিমেডিসিনেও সেবা গ্রহণ করা যাচ্ছে প্রভৃতি।

নিউ মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব

সবকিছুরই ভালো-মন্দ দুটো দিক থাকে। অস্বীকার করার উপায় নেই, নিউ মিডিয়া এখন গ্রাস করে চলেছে প্রচলিত গণমাধ্যমকে। ইতোমধ্যে নিউ মিডিয়ার বহু নেতিবাচক দিক সামনে চলে এসেছে। প্রকৃত অর্থে নিউ মিডিয়া নিজ থেকে নেতিবাচক কিছু করে না। যা করার তা ব্যবহারকারীরাই করেন। ব্যবহারকারীদের সকলের শিক্ষা, রুচি, সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ, নান্দনিক ভাবনা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চিন্তা এক রকম নয়। ফলে প্রজ্ঞা, রুচি ও নীতিনৈতিকতার বিষয়টির বিস্তর ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। নিউ মিডিয়ার অমিত শক্তির যে সুবিধা সেসবের অপব্যবহার করছেন অনেকেই। নিউ মিডিয়া পরোক্ষভাবে আমাদের সামাজিক জীবন ও পারিবারিক বন্ধনে প্রভাব

ফেলছে। আগে মানুষ পরিবারকে সময় দিত, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিত, গল্প করত, সবাই একসঙ্গে ড্রয়িং রুমে বসে টেলিভিশন দেখত, একসঙ্গে সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা উপভোগ করত। এখন প্রতিটি মানুষ আলাদা আলাদা ডিভাইসে সময় অতিবাহিত করেন। দুদণ্ড বসে কথা বলার, মুখোমুখি বসার সময় কোথায়! আর ভার্চুয়াল জগতে যাদের সঙ্গে পরিচয়, আলাপ, আড্ডা ও মতবিনিময় হচ্ছে, তারাও যে ষোলোআনা খাঁটি সেই কথাও তো হলফ করে বলা যাচ্ছে না। তারপরও অলীক এই জগতের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে মানুষ। যত দিন যাচ্ছে ততই আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে নিউ মিডিয়া। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ডার্ক ওয়েবের তৎপরতা, হ্যাকারদের অপতৎপরতা। আর নিরাপত্তার প্রশ্ন তো বরাবরই থেকে যাচ্ছে! বাস্তব জীবনের পাশাপাশি মানুষ এখন 'ভার্চুয়াল জীবন' নামে আরেকটা জীবনযাপন করছে। এই 'ভার্চুয়াল জীবন' এ অনেকেই সীমা লঙ্ঘন করছেন, অবতীর্ণ হচ্ছেন দ্বৈত-চরিত্রে। নিউ মিডিয়া ব্যবহার করে দুর্বৃত্তরা চাঁদা দাবি করছে, পরিচয় গোপন করে হুমকি দিচ্ছে, নারীকে উত্ত্যক্ত করছে, ভিডিও ও অডিও ধারণ করে ব্ল্যাকমেইল করছে! এর ফলে বাস্তব ও সামাজিক জীবনে ব্যক্তি ও পরিবার নানা রকম জটিলতার মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে। অনেকে মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে সম্পর্ক তৈরি করে প্রতারিত হচ্ছেন, ঠকে যাচ্ছেন। মানুষ মানুষের প্রতি হারিয়ে ফেলছে আস্থা। নিউ মিডিয়া এখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রচারণার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক নেতারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জনসংযোগ করছেন। নির্বাচনের আগে জনমত যাচাই ও প্রচারণা করছেন। অসত্য তথ্য প্রচার, গুজব, প্রতিহিংসামূলক অসুস্থ প্রচারণা অনেক ক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতার জন্ম দিচ্ছে। ফলে সহিংসতা, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে হেয়প্রতিপন্ন করা, সাম্প্রদায়িক হামলার মতো ঘটনাও ঘটছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কখনো কখনো বিদ্বেষের ভাগাড়ে পরিণত হচ্ছে। অনেক সুবিধা ও উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও, এই নিউ মিডিয়ার নানান ক্ষতিকারক প্রভাব রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় তুলে ধরা হলো— বাস্তবতার সাথে ভার্চুয়াল জীবনের দ্বন্দ্ব; একাকিত্বে নিমজ্জিত হওয়া; আত্মমগ্ন হয়ে পড়া; হতাশা ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি; সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি; মূল্যবোধের অবক্ষয়; প্রতারণার শিকার; মাদকের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি; পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে সামাজিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হচ্ছে; জঙ্গিবাদে সম্পৃক্ততার ঝুঁকি; হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে গোপনীয় তথ্য চুরি হচ্ছে; সাইবার আক্রমণ সংঘটিত হচ্ছে; ক্রেডিট কার্ডের তথ্য চুরির মাধ্যমে ই-কমার্স

হুমকির মুখে; ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হচ্ছে; সাইবার আক্রমণ সংঘটিত হচ্ছে; নিরাপত্তাহীনতা; গুজব বা তথ্যসন্ত্রাস।

সম্প্রতি একটি অনলাইন সংঘবদ্ধ অপরাধীচক্র 'স্ট্রিমকার' নামে একটি জুয়া খেলার অ্যাপ ব্যবহার করে দেশের বাইরে টাকা পাচার করে আসছিল। এই অনলাইন জুয়ায় বিটকয়েনসহ আরো কিছু অনলাইন মুদ্রা ব্যবহার করত। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, চরম সহিংস ও ভয়ংকর আসক্তি সৃষ্টিকারী পাবজি গেমের ইন অ্যাপ ক্রয় করে মাসে অন্তত ৭০ থেকে ৯০ কোটি টাকা বাংলাদেশ থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে।[২৭] কুরুচিপূর্ণ ছবি-ভিডিও প্রকাশ করে কাউকে হেনস্তা করা, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও গুজব ছড়ানো নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। মতাদর্শগতভাবে পৃথক গ্রুপগুলো ফেসবুকের মাধ্যমে একে অপরকে হেয়প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে। অশ্লীল, কুরুচিকর মন্তব্য, উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভুল, বানোয়াট কিংবা মিথ্যা তথ্য প্রকাশ ও সম্মান হানিকর মন্তব্য প্রকাশ করা হচ্ছে। এসবের মধ্যে ভয়াবহ হচ্ছে ছবি এডিটিংয়ে সুপার ইম্পোজের মাধ্যমে একজনের ছবিব অবয়বে অন্যের ছবি জুড়ে দেওয়া। ফেসবুক আইডি হ্যাক, ই-মেইল আইডি হ্যাক, বিভিন্ন ধরনের পর্নো সাইট বা ব্যক্তিগত ছবি পর্নো সাইটে ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে ব্ল্যাকমেইলের অসংখ্য ঘটনা ঘটছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনলাইনভিত্তিক নতুন ধরনের অপরাধ পারিবারিক ও সামাজিক শঙ্কার মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে দিন দিন। এসব অপরাধের সঙ্গে জড়িতরা একা নন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও আরও কিছু অ্যাপসের মাধ্যমে নানাধরনের অপরাধী চক্র সংঘবদ্ধভাবে সক্রিয় থাকে। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর মৃত্যুর ঘটনার সূত্র ধরে পুলিশ প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে ভয়ংকর মাদক এলএসডির সন্ধান পেয়েছ।[২৮] এই মাদকের বিষয়ে প্রথম যোগাযোগ শুরু হয়েছিল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। মাদকসেবন ও সরবরাহকারীদের অসংখ্য অনলাইন ক্লোজ গ্রুপ রয়েছে। নানা প্রলোভন আর বন্ধুত্বের আড়ালে তারা মাদক ব্যবসার শক্তিশালী সিন্ডিকেট গড়ে তোলে এসব ক্লোজ গ্রুপের মাধ্যমে। মাদক ও যৌনতা হাত ধরাধরি করে চলে। তরুণ প্রজন্মের কাছে নিউ মিডিয়ার মাধ্যমে মাদকের হাত ধরেই আসে যৌন অসততা! নিউ মিডিয়ার ভয়ংকর ক্ষতিকর দিক হলো কিশোর-কিশোরীদের কাছে পর্নোসাইট উন্মুক্ত হয়ে পড়া।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে শিশু, কিশোর ও তরুণ প্রজন্মকে। সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন গড়ে তোলার জন্য যে বয়সে মাঠে গিয়ে

খেলাধুলা করার ভীষণ প্রয়োজন, সে সময়টাতে শিশু, কিশোর ও তরুণ প্রজন্ম প্রায় আটকা থাকছে অনলাইন মাধ্যমের মায়ায়। হাতে হাতে এখন ট্যাব বা স্মার্টফোন, টেবিলে টেবিলে ল্যাপটপ, ডেস্কটপ আর গেম পিসি। এত এত প্রযুক্তিসর্বস্ব রঙিন দুনিয়ার হাতছানি, যা উপেক্ষা করা কঠিন! অনলাইন দুনিয়ায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে কেবল নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার অসুস্থ প্রতিযোগিতায় দৌড়াচ্ছে সবাই। অনলাইন মাধ্যমে ভাবছে নানা ভাবনা! পরিকল্পনা করতে হচ্ছে– এমন কী কথা লেখা যাবে, এমনকি ছবি বা ভিডিও কনটেন্ট পোস্ট করা যাবে! যাতে লাইক, শেয়ার, ইমোজির বন্যা বয়ে যাবে! কিশোর ও তরুণ বয়সে যখন তাদের ভবিষ্যতে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখার কথা, তখন তারা নিউ মিডিয়ায় পোস্ট করার জন্য কনটেন্ট তৈরি করছে, অনলাইন গেম খেলছে অথবা গ্রুপ চ্যাটিং করছে। এসব ভার্চুয়াল কর্মকাণ্ডে নিমেষেই ফুরিয়ে যাচ্ছে লম্বা সময়। মূল্যবান এই সময়ের অপচয় শিশু, কিশোর ও তরুণ বয়সে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। মূল্যবান সময় অপচয়ের ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে একাডেমিক মেধার বিকাশ। অনলাইন কর্মকাণ্ডের প্রতি একধরনের আসক্তি তৈরি হওয়ায়, প্রচণ্ড ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, স্বাস্থ্যহানি ঘটে। এসব কারণে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যথার্থ ব্যবহার না করার দরুণ বহু শিক্ষার্থী মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নিউ মিডিয়া অতি মাত্রায় ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পিতা-মাতার দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের প্রতিবেশের চারদিকে চোখ মেলে তাকালে নতুন প্রজন্মের অস্বাভাবিক এই আচার-আচরণের উত্তাপ দেখতে পাওয়া যায়। এধরনের আচার-আচরণ থেকে কিশোর ও তরুণদের মনোবৈকল্য তৈরি হচ্ছে! জঙ্গি সংগঠনগুলো তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও নিজেদের সংগঠিত করার কাজে ব্যাপকভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যবহার করে থাকে। আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনগুলো তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও তরুণদের সংগঠনে সংযুক্ত করার কাজে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সাহায্য নিয়ে থাকে।[২৯] জঙ্গি সংগঠনগুলো তাদের সঙ্গে যোগ দিতে কোমলমতি তরুণদের উদ্বুদ্ধ করে। অনেক তরুণ-তরুণী অনলাইন বক্তব্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে অনেকে ফাঁদে পা দিয়ে গোপনে দেশত্যাগ করেছে। জঙ্গি সংগঠনগুলো অনেক দিন ধরেই তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও নিজেদের সংগঠিত করা ও নতুন সদস্য সংগ্রহ ও অন্তর্ভুক্ত করার কাজে ব্যাপকভাবে নিউ মিডিয়াকে ব্যবহার করে আসছে। নাশকতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানোর প্রথম উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাপসকে। এমনকি নাশকতা-হত্যা-সন্ত্রাসের পর তার কথা জানান দিতে ব্যবহার করছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম।

নিউ মিডিয়ার কনটেন্টগুলো বেশিরভাগ সময়েই সুকৌশলে নির্মাণ করা হয়ে থাকে, যা দেখে সাধারণের মনে বাস্তবজীবনের সাথে ভার্চুয়াল জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত তৈরি করে। অন্যের জীবনের কেবল ভালো বিষয়গুলো বারবার দেখতে দেখতে নিজের অজান্তেই মনের মধ্যে জন্ম নেয় হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা ও অসন্তোষের বিষচারা। যা একজন মানুষের স্বাভাবিক জীবনে অশান্তি ডেকে আনার জন্য যথেষ্ট। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে মানুষের মনে একাকিত্বের অনুভূতি বেড়ে যায়। ফলে একজন একাকী মানুষ নিজের মনের অবচেতনেই নিজেকে বিষণ্নতার চাদরে মুড়িয়ে ফেলে।

উপসংহার

নিউ মিডিয়া হচ্ছে অমিত সম্ভাবনার অপর নাম। তবে একে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে জানতে হবে। তারুণ্য আর ইন্টারনেট সব অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে। গতিময় বিশ্বকে অনাগত দিনে নিউ মিডিয়া আরো বদলে দেবে। বৈশ্বিক গ্রাম ধারণাকে আরো বাস্তব, সত্যি ও সার্থক করে তুলবে। সুষ্ঠু সংস্কৃতি বিকাশ, মানবতা চর্চা, গণতন্ত্র, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও মানুষের অধিকার রক্ষায় নিউ মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, সেটাই সকলের প্রত্যাশা। মঙ্গলালোকে বিশ্বকে ভরিয়ে দিবে নিউ মিডিয়া। এই মাধ্যমের নতুন জগৎ, নতুন আকাশে ভাবনার পাখা মেলতে হবে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে। অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে, আলোটুকু গ্রহণ করতে হবে। নিউ মিডিয়া হলো গ্রাফিক ডিজাইন, প্রতীক, নকশা ও আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর একটি মাধ্যম। নিউ মিডিয়া কল্পনা, তথ্য, ছবি গ্রাহকচাহিদা প্রভৃতির সংমিশ্রণে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে একটি দৃশ্যমান কনটেন্ট তৈরি করা হয়। লাইক, ভিউ, শেয়ার প্রভৃতির বাণিজ্যিক প্রয়োজনের গর্ভ থেকে জাত এই মাধ্যম বর্তমানে শিল্পমানহীন ভিজ্যুয়াল ভাষা তৈরি করছে। সফটওয়্যারের উৎকর্ষে ডিজাইনের সৌন্দর্যকরণের কৌশলে অবিশ্বাস্য পরিবর্তন এসেছে।

বর্তমান সময়ের অনলাইনে মাধ্যমে কতিপয় হাতুড়ে ডিজাইনার বা কম্পিউটার অপারেটরদের মাধ্যমের গ্রাফিক ডিজাইনে নিউজফিড প্লাবিত হচ্ছে। বেশির ডিজাইন মানহীন ও অনান্দনিক। উদ্ভট নকশা, উৎকট রঙের আধিক্য, ভুল বানানের ছড়াছড়ি, চিন্তার দৈন্য, ছবির ব্যবহারে পরিমিতি বোধের অভাব প্রভৃতি বিশেষভাবে ধরা দেয়। এসব অসঙ্গতির সমন্বিত ডিজাইনে অনান্দনিক ভিজ্যুয়াল বাস্তবতার ভিত্তিভূমিতে অবস্থান করছে বর্তমান সময়। কদর্য ডিজাইনের মুখোমুখি

হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আজকের শিশুকিশোর ও তরুণ প্রজন্ম। অনলাইনের দেশীয় কনটেন্টের পারিপার্শ্বিক ভিজ্যুয়াল যোগাযোগে দীক্ষিত হয়ে বর্তমান প্রজন্মের মনন গঠন হচ্ছে। রুচিশীল মনন গড়ে তুলতে অনলাইন মাধ্যমগুলোতে পরিমার্জিত সর্বজনীন ভিজ্যুয়াল মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। নিউ মিডিয়ার প্রযুক্তিগত সহজলভ্য উপস্থাপনায় কারণে রুচির দৈন্য প্রকাশে সবাই যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের রাশ টানতে হবে এখনই। নান্দনিক বোধ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান ও গাইডলাইন না থাকার ফলে নিউ মিডিয়া কনটেন্ট নির্মাতাগণ কিছু বিষয়ের প্রাথমিক ধারণা নিয়েই পেশাদার জগতে পা রাখছেন। কিন্তু ঘাটতি থেকে যাচ্ছে কনটেন্ট উপস্থাপনা ও নন্দনভাবনার মৌলিক শিক্ষায়। অধিকাংশ কনটেন্ট দুর্বল, কম্পোজিশনে ছন্দ নেই, নেই কোনো ঐকতান, নেই কনটেন্ট ও ভিজ্যুয়ালের সুষম ব্যবহার। মূলত সফট্ওয়্যার অপারেটর হিসেবে কনটেন্ট নির্মাতারা প্রোডাকশন নির্মাণ করছেন। যার ফলে আশঙ্কাজনকভাবে সম্প্রচার ও অনলাইন মাধ্যমে পরিলক্ষিত হচ্ছে অসংগত ও অনান্দনিক সব ডিজাইন। একাডেমিক শিক্ষার উৎকর্ষের মাধ্যমে অনলাইন মাধ্যমের সামগ্রিক ভিজ্যুয়ালের নান্দনিক মান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। নিউ মিডিয়া ব্যবহারকারী সাধারণ জনমানুষের ভিজ্যুয়াল ও সাংস্কৃতিক রুচি বিনির্মাণের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এই বিষয়ে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমানে অনলাইন মুক্তবাজারের অপসংস্কৃতিক আগ্রাসনে সুস্থ ও নির্মল সংস্কৃতি বিলুপ্ত হওয়ার পথে। অপসংস্কৃতির আগ্রাসনে ভেসে যাচ্ছে সুস্থ ধারার নিজস্ব সংস্কৃতি। অনলাইন মিডিয়ার এই আগ্রাসনের কালে ভালো মানের কনটেন্ট তৈরি করতে হবে। একটি জাতির সার্বিক উন্নয়নে শুধুমাত্র দৃশ্যমান পথঘাট, কংক্রিটের উঁচু উঁচু কাঁচঘেরা দালনকোঠা বা আধুনিক সব স্থাপনাতেই সীমাবদ্ধ নয়, একটি জাতির উচ্চতা নির্ভর করে সেই দেশের নাগরিকের শিক্ষা, জীবন ও সংস্কৃতির মানের ওপর ভিত্তি করে। বাংলাদেশের অনলাইন মিডিয়ায় বর্তমান যে কদর্য কনটেন্টের স্বেচ্ছাচারিতা চলছে সেসবের বিপরীতে সুস্থ ধারার সংস্কৃতি ও জনরুচি বিনির্মাণে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। নিউ মিডিয়া নব্যরেনেসাঁর এই যুগসন্ধিক্ষণে অন্তর্জালে একটি বৃহৎ সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই বিষয়ে সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অ্যাকাডেমিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার আয়োজন বৃদ্ধি করতে হবে। ডিজিটাল সময়ে ডিজিটাল মাধ্যমেই এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব করতে হবে। বাংলা ও বাঙালির চিরায়ত হাজার বছরের ঐতিহ্য, মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐশ্বর্য, দেশকাল, ভূগোল, মাটি-মানুষ ও প্রকৃতিকে ধারণ করে নিউ

মিডিয়ার সকল প্ল্যাটফর্মে বিনির্মাণ করতে হবে আমাদের নিজস্ব একটি সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক মানদণ্ড।

টীকা

১. ড. মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, প্রকাশনায় : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ, অষ্টাদশ সংস্করণ, ২০১৫, পৃ-১১০৩।

২. *গ্লোবাল ভিলেজ* ধারণাটি সর্বপ্রথম তুলে ধরেন বিশিষ্ট কানাডিয়ান দার্শনিক Herbert Marshall McLuhan (১৯১১-১৯৮০)। তিনি ১৯৬২ সালে তাঁর *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man* নামক বইয়ে প্রথম বিশ্বগ্রামের ধারণা দেন। Marshall McLuhan-এর মতে, 'গ্লোবাল ভিলেজ' বলতে এমন একটি ধারণাকে বোঝানো হয়, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের লোকজন পরস্পরের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ, কথোপকথন, গণমাধ্যম ও ইলেকট্রনিক যোগাযোগের মাধ্যমে যুক্ত থাকে এবং ক্রমেই একটি একক কমিউনিটিতে পরিণত হয়। বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি এবং তথ্যের দ্রুত বিচরণ দ্বারা বিশ্ব একটি গ্রাম বা ভিলেজের রূপ লাভ করেছে।

৩. Internet World Stats, Population and Internet Users in all countries and usage in all regions of the world. (www.internetworldstats.com)

৪. Number of Twitter Users 2022: Demographics, Breakdowns & Predictions. (https://financesonline.com)

৫. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১*, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, ঢাকা পৃ-৮

৬. BTRC Annual Report 2019-2020, Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission, IEB Bahban, Ramna, Dhaka-1000, P-15

৭. শাহেদ মুহাম্মদ আলী সম্পাদিত *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, করোনায় ই-কমার্সের পালে হাওয়া, ৭ এপ্রিল ২০২১ (https://www.kalerkantho.com/home/printnews/103125 1/2021-05-07)

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অন্তর মম বিকশিত করো', *গীতাঞ্জলি*, শান্তিনিকেতন গ্রন্থনবিভাগ থেকে প্রকাশিত, ১৯১০, পৃ-৮

৯. Noah Wardrip-Fruin and Nick Montfort, *The new media reader*, The MIT Press, Cambridge Massachusetts, London, England, 2003, P-16

১০. Rachel Swatman, *1971: First Ever Email*, 19 August 2015 (https://www.guinnessworldrecords.com/news/60at60/2015 /8/1971-first-ever-email-392973)

১১. IRC: History, Origin, and More (https://history-computer.com/irc-guide/)

১২. Chenda Ngak, *Then and now: a history of social networking sites*, 6 July 2011, CBS NEWS (https://www.cbsnews.com/pictures/then-and-now-a-history-of-social-networking-sites/)

১৩. Scott Aaron, *The Linked-In Book For Network Marketing*, USA, 2019 (https://about.linkedin.com)

১৪. Sarah Phillips, *A brief history of Facebook*, The Guardian, 25 July 2007, (https://www.theguardian.com/technology/2007/jul/25/media.newmedia)

১৫. Alina Vytiaz, *YouTube – a new era of TV*, Masaryk University, Brno, 2018, P-08 (https://www.britannica.com/topic/YouTube)

১৬. Jessica Demilt, *The Origins of Twitter*, Pennington Creative, Tucson, USA (https://penningtoncreative.com/the-origins-of-twitter/)

১৭. Aashish Pahwa, *The History of WhatsApp*, Feedough, September 8, 2021 (https://www.whatsapp.com/about/)

১৮. আবদুল কাদির সম্পাদিত, *নজরুল রচনাবলী* (তৃতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, মে ১৯৯৬, পৃ-৫৬৭

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রাজা*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ-২৬

২০. Megan Dobransky, *The History and Future of OTT Streaming*, CONVIVA, 20 April 2021 (https://www.conviva.com/the-history-and-future-of-ott-streaming/)

২১. প্রাগুক্ত

২২. https://en.wikipedia.org/wiki/Emoji

২৩. Jacopo Prisco, *Shigetaka Kurita: The man who invented emoji*, CNN Style, 23 May 2018 (https://edition.cnn.com/style/article/emoji-shigetaka-kurita-standards-manual/index.html)

২৪. প্রাগুক্ত

২৫. নানান দেশের নানান ভাষা।
বিনে স্বদেশী ভাষা,

পুরে কি আশা?
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর
ধারাজল বিনে কভু
ঘুচে কি তৃষা?

২৬. Noam Chomsky, *The Science of Language: Interviews with James McGilvray*, Cambridge University Press, New York, 1st Edition 2012, P-6

২৭. এ. হালিম, *ফ্রি ফায়ার-পাবজিতে চলে যাচ্ছে কোটি কোটি টাকা*, বাংলা ট্রিবিউন, ২১ মে ২০২১ (https://www.banglatribune.com/tech-and-gadget/tech-news/681683/)

২৮. আহমেদ জায়িফ, *ঢাবি ছাত্র হাফিজুরের মৃত্যু তদন্ত করতে গিয়ে পাওয়া গেল এলএসডি মাদক*, প্রথম আলো, ঢাকা, ২৭ মে ২০২১ (https://www.prothomalo.com/bangladesh/crime/)

২৯. মহিউদ্দিন সরকার সম্পাদিত অনলাইন পোর্টাল ঢাকা পোস্ট, *জঙ্গি সংগঠনের সদস্য সংগ্রহ করতেন নাঈম*, ৩১ মার্চ ২০২২ (https://www.dhakapost.com/national/107540)

লেখক পরিচিতি : **ড. ইসলাম শফিক**, শিক্ষক, গণমাধ্যম গবেষক ও পরামর্শক।

চলনবিল অঞ্চলের জাগগান : একটি সমীক্ষা

ড. মো. আমিরুল ইসলাম

Abstract

Jaggan is one kind of popular rural peasant music in greater Chalanbil area of Bangladesh. The social context of Jaggan refers to the peasant life, the people who make music, listen to music and participate. This article aims to understand how Jaggan or Awaking music works within the culture or society of Chalanbil. This is not only the description of the music but also the observation of environment or content in which music is made. In past ages, during the winter season while the peasants slept in deep, the thieves and robbers got their cattle or valuable properties. Then the rural young generation began to practice stick fight to protest the rogue men. They made music and performed to awake people from sleep and travelled peasant's door to door in night of whole the month of poush. For creative recreation they adopt the theme of krishnayatra, panchali and muslim spiritual music. Some rituals of hindu and muslim added in symbol with the music. Sonapir or Sona Roy is the common person which is respected to both communities. Actually, Jaggan is a non-communal music of rural Bengal. This is the texture, text and contextual study of Jaggan through histo-geographical aspiration.

১. প্রাক-কথন

'জাগ' হলো জাগরণের সংক্ষিপ্ত রূপ। জাগ্রত করার নিমিত্তে যে গীত, তারই নাম জাগগান। জাগগান ক্ষেত্রবিশেষে জাগের গান, মাঙার গান, মাঙনের গান, সোনা পীরের গান, সোনা রায়ের গান, সোনা রায় কালু রায়ের গান, পৌষসংক্রান্তির গান প্রভৃতি অভিধায় ব্যপ্ত। আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষায়, 'রাত্রি জাগিয়া এই গান গাহিতে হয় বলিয়া ইহার নাম জাগগান। জাগ শব্দটি জাগা শব্দ হইতেই আসিয়াছে। এই অর্থে জাগরণ কথাটি বাংলার সর্বত্র ব্যবহৃত হয়; যেমন, ভাদু গান, ভাদুর জাগরণ, মনসার গান, মনসার জাগরণ ইত্যাদি। রংপুর জিলাই

জাগগানের কেন্দ্রস্থল, এখান হইতে ইহা রাজসাহী ও পাবনা অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করিয়াছে, কিন্তু সে সকল অঞ্চলে ইহা রংপুরের মত এত ব্যাপক প্রচার লাভ করিতে পারে নাই'।[১] মাঙনের উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রচলিত এই ধারার গান বাংলাদেশের চলনবিল অঞ্চলে জাগগান এবং মাঙনের গান নামেই সমধিক পরিচিত। লাঠিখেলার সাথে জাগগানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। গ্রাম প্রতিরক্ষা এবং পাহারার প্রয়োজনে যুবক ছেলেরা পৌষ মাসে দিনের বেলায় লাঠি খেলার কসরত করতেন এবং রাতের বেলায় সোনা রায়, সোনা পীর বা মানিক পীরের প্রতিকৃতি তৈরি করে সমস্বরে বন্দনা ও গান পরিবেশন করতেন। বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের চলনবিল-বিধৌত পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, বগুড়া এবং উত্তরের জেলা বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলেও পূর্বে জাগগানের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে বিলুপ্তপ্রায় জাগগানের ইতিহাস, বিষয়, পরিবেশনা এবং স্বরূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির আশ্রয়ে তথ্য চিত্রায়ণ কৌশলের সাথে বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে এই অনুসন্ধান কর্মটি পরিচালিত হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ ও কৌশলের প্রয়োজনে জাগগানের Texture, Text, and Context ভিত্তিক উপস্থাপন করা হয়েছে। অ্যালান ডান্ডিসের ভাষায়, 'Once you understand the methods of fieldwork, you need to know the kind of data to look for. The three basic elements of an item of folklore that you'll need to take account of are Texture, text and context (Dundes, 1980)'.[2] Esoteric/Exoteric Factor মাথায় রেখে মূল গায়েন, শ্রোতা এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষের সাথে কথা বলা হয়েছে 'Groups that are closely-knit and have a strong sense of social identity and social solidarity express attitudes, beliefs, and concerns about themselves and others (Jansen 1959)'.[৩]

২. জাগগানের উৎপত্তি

জাগগান বাঙালির নিজস্ব বিষয়বস্তুর গুণেই বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেও বাঙালিরই সামগ্রিক লোকসংগীতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে Unity in diversity'র নীতিটি রক্ষিত হয়েছে। সে জন্য এ গান আঞ্চলিক হয়েও সমগ্র বাংলার অখণ্ড ফোকলোরেরই অবিভাজ্য অঙ্গ। বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রণেতা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিধানে 'জাগ'-এর তিনটি ভুক্তি উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে প্রথম ভুক্তিতেই তিনি উদাহরণ ও ব্যুৎপত্তিসহ ১০টি অর্থ প্রকাশ করেছেন। এই

দশটি অর্থ প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বাংলা ভাষায় প্রয়োগযোগ্য বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের সংগ্রহ ও বিবৃতিতে সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি যেমন দিয়েছেন, তেমনই অসংস্কৃত শব্দেরও উদাহরণসমেত ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয় 'জাগ' - এর প্রথম অর্থটি। যথা : **জাগ** অর্ম্ম [সং √ জাগৃ > প্রা √জগ্‌গ > লা √জাগ; হি, ঠ, গু, মৈ, √অস জাগ] জাগরিত হওয়া; জাগা। "সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।"[৪] বাংলা একাডেমি প্রকাশিত ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে জাগ-গান শীর্ষক ভুক্তিতে বলা হয়েছে, 'পল্লী অঞ্চলের রাখালদের পৌষ মাসে রাত জেগে গাওয়ার গান ও উৎসব'।[৫] পুরাকাল থেকেই চলনবিল অঞ্চলের মানুষ নিজেদের নিরাপত্তার প্রয়োজনেই লাঠি ও সড়কি চালনায় পারদর্শিতা অর্জন করে শত্রু মোকাবেলায় সদা প্রস্তুত থাকতেন। যার ধারাবাহিকতায় আজও চলনবিল অঞ্চলে লাঠিখেলা বেশ সমারোহের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। পৌষ মাসে রাত জেগে গ্রাম পাহারা দেওয়া ছিল অতীতের গ্রাম্য যুবকদের নৈমিত্তিক ঘটনা। পৌষ মাসের তীব্র শীতে মানুষ যখন গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন থাকত, তখন বেড়ে যেত সিঁধেল চোর আর ডাকাতদের উৎপাত। লাঠি খেলার মাধ্যমে তীব্র শীতে যুবকদের শরীর যেমন উত্তাপ থাকত, তেমনই দলবদ্ধ হয়ে গাওয়া জাগগানের মাধ্যমে মনও থাকত প্রফুল্ল। বাড়ি বাড়ি গেয়ে গেয়ে চাল-লঙ্কা সংগ্রহ করার আনন্দই ছিল মুখ্য। কাজেই, লাঠিখেলা ও গ্রাম প্রতিরক্ষার সাথে জাগগানের উদ্ভবের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সাধারণত রাতে গান করা হতো এবং দিনে চাল সংগ্রহ করা হতো। কৃষকের ইহলৌকিক কল্যাণ কামনার নিমিত্তে আচরিত সংস্কার এবং বিশেষ ব্রত উদ্‌যাপনও এই জাগের সাথে সম্পর্কযুক্ত। জাগগানের উৎপত্তি সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, 'আদিম সমাজের মধ্যে পূর্বে যে সকল যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইত, তাহাদের উপর ভিত্তি করিয়া সমাজে বহু বীরত্বমূলক কাহিনী প্রচার লাভ করিত– আদিম সমাজে এই সকল উপজাতীয় গৌরব-প্রচারমূলক কীর্তন-কাহিনী করিবার বৎসরের মধ্যে নির্দিষ্ট একটি সময় থাকিত। এখনও আসামের উপজাতীয় অঞ্চলে এই রীতি প্রচলিত আছে। মনে হয়, এই প্রকার কোন ঐতিহ্যের ভিত্তি হইতেই জাগগানগুলির উৎপত্তি হইয়াছে'।[৬]

বাংলায় মগ-ফিরিঙ্গি ও বর্গির অত্যাচার নিয়ে নানা লোককথা, কিংবদন্তি, ছড়া এবং প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, 'পাঠান অভ্যুদয়ের পর হইতেই বঙ্গদেশের স্বাধীন নৃপতিগণের ক্ষমতা অল্পবিস্তর হ্রাস হইতে লাগিল; এবং তৎসঙ্গে বিদেশী দস্যুগণ সময়ে সময়ে নিম্নবঙ্গে এবং সমুদ্রোপকূলস্থিত রাজ্যে লুণ্ঠনাদি করিত। এই দস্যুদিগের মধ্যে মগ এবং পর্তুগিজ

দ্বারা এই দেশের যত ক্ষতি হইয়াছে, অন্যান্য জাতি কর্তৃক তাহার শতাংশের একাংশও হয় নাই। এই দুই জাতি কখনও বা একত্র, কখনও বা বিভিন্নভাবে আক্রমণ করিয়া নগর ও গ্রাম প্রভৃতি উৎসাদিত করিত। রাজা তাহাদের সম্যকরূপে দমন করিতে পারিতেন না, কখনও কখনও দস্যুগণ কর্তৃক রাজসৈন্য পরাজিত ও বিনষ্ট হইত'।[৭] প্রমথনাথ বিশী রচিত আলোচিত উপন্যাস *চলনবিল*, *জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার* এবং অধ্যক্ষ এম এ হামিদ বিরচিত *চলনবিলের ইতিকথা ও চলনবিলের লোকসাহিত্য* গ্রন্থ থেকে জানা যায় অতীতে চলনবিল অঞ্চলে ছিল দস্যু-তস্করের ঘাঁটি। ব্রাহ্মণ ডাকাত পণ্ডিত তাড়াসের কোহিতের বেনী রায়, উধুনিয়ার উধু ও ধনিয়া ডাকাত, পাবনার পবন ডাকাত প্রমুখ নিয়ে অনেক অনেক কাহিনি আজও চলনবিল অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে ফেরে। এমনকি চলনবিল অঞ্চলের কোনো কোনো জমিদারিও গড়ে উঠেছিল ডাকাতবৃত্তি থেকেই। সে সময় গামছা-ঠগীর অত্যাচারেও জনজীবন অতীষ্ট হয়ে উঠেছিল।

ব্রিটিশ কোম্পানির শাসনামলে বাংলার নবাবদের সেনাবাহিনী ও শাসন কাঠামো ভেঙে দেওয়া হয়। এর ফলে লক্ষ লক্ষ বেকার তৈরি হয়। এ সময় বাংলার সামাজিক জীবনে এক বিশৃঙ্খল ও অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষ। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পনির শাসনের মূলনীতি ছিল অর্থ। এই অর্থের লোভে পড়ে বেনিয়া কোম্পানির শাসকগোষ্ঠী সুপরিকল্পিতভাবে এদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতি ধ্বংস করে দিয়ে কোনো সুচিন্তনীয় রক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় এদেশের জনজীবনে নেমে আসে ভয়াবহ অভাব-অনটন–অন্নাভাব। মুঘল শাসনামলে যে ফকির সন্ন্যাসীগণ বিনা খাজনায় জমি ভোগদখল করে আসছিল এবং সর্বত্র যাদের গতি ছিল, তাদের ওপর খাজনা নির্ধারণ ও বহির্গমনের ওপর যখন হঠাৎ কঠোর বিধি-নিষেধ এবং অতিরিক্ত কর প্রয়োগ করা হলো তখন স্বভাবতই নিরীহ ফকির সন্ন্যাসীগণ বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হয়ে উঠলো। এমনকি ইংরেজ শাসকগণ এদের তীর্থ ভ্রমণকেও শোষণের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে পরিণত করে। বলা হয়ে থাকে, এরা একদিকে কৃষক অপরদিকে ফকির সন্ন্যাসী আর এই উভয় দিক থেকেই তারা বিদেশী শাসকদের শোষণ ও উৎপীড়নের শিকারে পরিণত হয়েছিলো বলেই নিজেদের জীবিকা ও ধর্ম রক্ষার জন্য তাদের বিদ্রোহ ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিলো না। কাজেই দলবদ্ধ হয়ে জমিদার মহাজনদের গোলায় জমানো ধান-চাল এবং সম্পত্তি লুট করা ছাড়া বিদ্রোহীদের গত্যন্তর ছিলো না। এছাড়া, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে বাংলাদেশের কৃষক জনসাধারণের যে ভয়াবহ অবস্থা দাঁড়িয়েছিলো

তার তুলনা সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে বিরল। দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক হান্টার বলেন, "এ দুর্ভিক্ষে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়, পরবর্তী দুই পুরুষকালেও তার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব হয়নি। ..... ১৭৭১ সাল শুরু হওয়ার আগেই এক পুরুষ কৃষকের এক-তৃতীয়াংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো। প্রত্যেকটি জেলাতে এই কাহিনী শুনতে পাওয়া যেত।"[৮]

দুর্ভিক্ষের কারণ খুঁজতে গিয়ে হান্টার বলেন, "প্রদেশে তখনও কিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ ছিলো এবং তা দিয়ে আরো ন' মাস চালানোর প্রয়োজন ছিলো। ... কিন্তু ফসল কাটার সময় তা কিনে মজুদ করে রাখা হতো। পরে, অনটনের সময় চড়া দামে বিক্রি করে বিপুল পরিমাণ মুনাফা করা হতো। ফলে দ্রুত দাম বেড়ে যেত। কাজেই দেশের কৃষক জনসাধারণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। হান্টার সাহেব আরো বলেন, "দুর্ভিক্ষ পরবর্তী কয়েক বছরে বহু সহায় সম্বলহীন নিরন্ন চাষী যোগ দেওয়ায় তাদের (ফকির-সন্ন্যাসীদের) সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। এসব কৃষকদের না ছিলো বীজধান, না ছিলো চাষাবাদের সাজ-সরঞ্জাম। ফলে একরকম বাধ্য হয়েই তারা সন্ন্যাসীদের দলে যোগ দেয়। এছাড়া, ফকির সন্ন্যাসীদের সাথে যোগদান করে মোগল বাহিনী থেকে চাকুরীচ্যুত সৈনিক, মসলিন তৈরির বেকার কারিগর, জেলে, তাঁতী, কামার এবং কুমার সম্প্রদায়। জাগগানের কথায় :

'টাকা নাইরে পয়সা নাইরে
কী টাকা বানাইলো কোম্পানী
টাকার পিঠে লেখা আছে
বিবি মহারাণী[৯]।
মাধব সুখে রাখিও ধেনু কি জাগ হে'।[১০]

আঠারো শতকের শেষে বাংলাদেশে ভয়াবহ অরাজকতা সৃষ্টি হয়। পলাশী যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের পর কার্যত ইংরেজগণ বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হন, কিন্তু ১৭৭২ সালের পূর্ব পর্যন্ত শাসনকাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। সম্ভবত ব্রিটিশরা তখনও বাংলার জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হননি বলেই পুতুলের ন্যায় তাদের আজ্ঞাবহ নবাবকে ক্ষমতায় বসিয়ে রাখেন। নবাব শাসন দায়িত্ব বহন করতেন কিন্তু তাঁর সামরিক ক্ষমতা বা অর্থ কোনো কিছুই ছিলো না। এজন্য জনসাধারণ তৎকালীন নবাবকে শ্রদ্ধা করতেন না। পক্ষান্তরে, অর্থাভাবে নবাব সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হন এবং বেকার সৈন্যের দল অভাবের তাড়নায় ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের সাথে জড়িয়ে পড়েন।

১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দের পর নবাবদেরকে বছরে মাত্র ৫,৩৮৬,০০০ টাকা ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়, এবং ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে ভাতা কমিয়ে রাখা হয় মাত্র ১৬ লাখ টাকা। রাজনৈতিক ক্ষমতা বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নবাবদের আয় বন্ধ হলো এবং সেনাবাহিনীকে প্রতিপালন ও বেতন-ভাতার মতো অর্থ না থাকায় ভেঙ্গে দেওয়া হলো একের পর এক সেনাবাহিনী। মীরজাফর নিজে ৮০,০০০ সৈনিককে বরখাস্ত করেন এবং নাসিমউদ্দৌলা তাঁর দেশের নামমাত্র মর্যাদা রক্ষার জন্য যত সৈন্য রাখার প্রয়োজন ঠিক তত সৈন্যই রাখার অনুমতি পান। ফলে বাংলা ও বিহারের শত শত সৈনিক চাকরি হারান।[১১] কোনো কোনো জমিদার দস্যু-ডাকাতদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন বলে দেশে অরাজক পরিস্থিতি আরও বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সাথে সাথে এদেশের জনসাধারণের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের অনীহা যুক্ত হওয়ার ফলে গ্রামবাসীগণ নিজেদের সুরক্ষায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। লৌকিক দেবতা ও কল্পিত পীর-ফকির হয়ে ওঠেন সন্ত্রস্ত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতীকী আশ্রয়। মুখে মুখে রচিত হয় জাগগানের আখ্যান। জাগগানের ব্যুৎপত্তি ও বিস্তারের সাথে ব্রিটিশের দুঃশাসন এবং পলাশীর যুদ্ধের স্মৃতির যোগও অভিন্ন।

৩. এলাকা নির্বাচন : জাগগান অধ্যুষিত চলনবিল অঞ্চল

বক্ষ্যমান প্রবন্ধের রসদ অনুসন্ধান করতে প্রাবন্ধিককে বর্তমান চলনবিল অঞ্চলে অনুসন্ধান পরিচালনা করতে হয়েছে। চলনবিল অঞ্চলের তাড়াশের মাগুড়া-বিনোদ, কোহিত, হান্ডিয়াল; গুরুদাসপুরের শ্রীপুর, পিপলা, চরপিপলা, খুবজীপুর, নাজিরপুর, চাঁপিলা, মশিন্দা, শিকারপুর, আনন্দনগর; সিংড়ার কলম, নূরপুর, গুটিয়া মহিষমারী প্রভৃতি গ্রামে নব্বই দশকের শুরুতেও জাগগান প্রচলিত ছিল। বর্তমানে এই গানের চর্চা অনেকটা বিলুপ্ত প্রায়। চলনবিল অঞ্চলের এই ঐতিহ্যবাহী গানের সাথে এ অঞ্চলের প্রাচীন বসতি স্থাপনের ইতিহাসও ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

পণ্ডিতগণ ধারণা করেন খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে চলনবিলের উঁচু এলাকসমূহে বসতি শুরু হয়। যুক্তিস্বরূপ তারা বড়াইগ্রাম থানার ধানাইদহ গ্রামের চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর গুপ্ত রাজা কুমার গুপ্তের তাম্রশাসন প্রাপ্তির কথা বলেন। এই তাম্রশাসন পাওয়ার পর পণ্ডিতবর্গ আরও জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা মনে করেন, চলনবিলের দক্ষিণ অংশ বিশেষ করে বড়াইগ্রাম ও চাটমোহর থানা অনেক পূর্ব থেকেই বাসোপযোগী ছিল। অপরদিকে রায়গঞ্জ, উল্লাপাড়া এবং

তাড়াশ থানার উত্তর প্রান্তে সেন রাজত্বকালে বেশ কিছু গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়। তাড়াশ থানার অন্তর্গত মাধাইনগর গ্রামে সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের রেভিনিউ সার্ভে নকশায় উত্তর-পশ্চিমে কলম, দক্ষিণ-পশ্চিমে গুনাইগাছী, পূর্বে হান্ডিয়াল ও তাড়াশ প্রভৃতি অল্পসংখ্যক গ্রাম এবং মাঝখানে চলনবিলের অংশবিশেষ এবং তাড়াশ থানার নওগাঁ শাহী মসজিদ দৃশ্যমান। ১৮৮৫ সালের প্রকাশিত Mr. E. Balfour সংকলিত 'Cyclopeadia of India' Vol:3, Page-355-এ বলা হয়েছে, "Towards the east, the marshes increase in number and size untill they merge in the great Chalanbeel on the district boundary ... Chalanbeel is in fact, a great reservoir of the surplus water supply of the whole surrounding country. It has connections with the rivers and water courses, which here lose their identity and during the rains it swells till it covers a total area of about 120 square miles."

১৯১৯ সালের ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়ার পাবনা অংশে উল্লেখ করা হয়েছে– "The only sheets of the water which can be called lakes are The Chalanbeel, which covers large portion of the regions and Chatmohor thanas." চলনবিল বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জলাভূমি অঞ্চল। নাটোর, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা এই তিন জেলার এগারোটি থানা মিলে বর্তমান চলনবিলের অবস্থান। নাটোরের সিংড়া, গুরুদাসপুর ও বড়াইগ্রাম; সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ, উল্লাপাড়া (আংশিক), তাড়াশ এবং নবগঠিত সলঙ্গা; পাবনা জেলার ফরিদপুর, ভাঙ্গুরা ও চাটমোহর থানা এলাকাকে বর্তমানে চলনবিল অঞ্চল নামে অভিহিত করা হয়। বর্তমান চলনবিল এলাকার আয়তন প্রায় আটশ বর্গমাইল। পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য ৩২ মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রস্থ সাড়ে ২৪ মাইল। বিলটি বিষুব রেখার ২৪°৭′ হতে এবং ২৪°৩৫′ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯°১০′ হতে ৮৯°৩৫′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। শুধু বাংলাদেশ নয় সমগ্র পাক-ভারত উপমহাদেশে চলনবিলের ন্যায় আয়তন বিশিষ্ট মিঠাপানির আর কোনো বিল আছে বলে জানা যায় না। চলনবিলের উত্তরে বগুড়া জেলাসীমা, দক্ষিণে পাবনা জেলার আটঘরিয়া ও ঈশ্বরদী থানা, পূর্বে উল্লাপাড়া সিরাজগঞ্জ রেললাইন এবং পশ্চিমে নওগাঁ জেলার আত্রাই ও রানীনগর থানা। রানীনগর থানার পারিল ইউনিয়নের রক্তদহ বিল একসময় চলনবিলের অংশ ছিল। ঈশ্বরদী উল্লাপাড়া রেললাইন তৈরির ফলে চলনবিল প্রথমে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এরপরে অনেক মহাসড়ক

এবং জেলা-উপজেলা সড়ক, ব্রিজ-কালভার্ট তৈরির ফলে চলনবিল এখন অনেক খণ্ড খণ্ড অংশে বিভাজিত।

৪. জাগগানের পরিবেশনা

সোনাপীরের দল পৌষের রাতে কৃষকের বাড়ি গিয়ে হাঁক ছেড়ে বলে, 'ছত্বর ছত্বর সোনাপীরের বর এলো বত্তর অন্তর।' আঞ্চলিক উচ্চারণে সত্বর সত্বর হয়ে উঠেছে ছত্বর ছত্বর, বৎসর অন্তর হয়ে উঠেছে বত্তর অন্তর। হিন্দু-মুসলিম কৃষক পরিবারের একটা অপেক্ষা থাকে বছর শেষে জাগগানের দল আসবে, আশীর্বাদ বর্ষণ করবে। সংসারে সমৃদ্ধি আসবে। এক বছরের জন্য গরুর পাল নিরাপদ থাকবে।[১২] গানের বন্দনার আগে কৃষকের ভিটেয় পা দিয়েই উচ্চারণ করে, 'ছত্বর ছত্বর সোনাপীরের বর এলো বত্তর অন্তর।' চলনবিল অঞ্চলে জাগগানের গায়েনদের খেরু নামে অভিহিত করা হয়। প্রধান গায়ককে বলা হয় মূল খেরু। প্রথমে মূল খেরু গেয়ে ওঠেন, এরপরে সকলে সমস্বরে তার পুনরাবৃত্তি করেন। গানের কোরাস হিসেবে থাকে, ' মাধব সুখে রাখিও ধেনু কি জাগ হে'; 'জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর'; 'ও মা দয়া নাই রে তোর মা হয়্যা বেটাক বলে, তুমি ননী চোর'; 'দেওয়ান সাজিল রে, দেওয়ান মানিকও পীর' প্রভৃতি চরণ। এরপর বন্দনা অংশ পরিবেশিত হয়। গানের শেষে থাকে সমস্বরে 'সুবল সুবল' কথার উচ্চারণ। এই কথার উচ্চারণের সাথে সাথেই গানের সমাপ্তি ঘটানো হয়। যথা:

'ছত্বর ছত্বর সোনাপীরের বর এলো বত্তর অন্তর।'
চলরে খেরুয়া ভাইরে অন্য বাড়ী যাই,
এ বাড়ীর মানুষ-গরুর বাড়ুকও পরমাই।
এক বাড়ীর কাজ নারে ভাই, পাঁচ বাড়ী বেড়াই
নিপুতার হোক পুতুরে ডাকুক বাপ ও ভাই।[১৩]
(সুবোল, সুবোল)
রাধের কাপড় কানাইর বাঁশি রাখলো এক ঠাঁই,
রাধের কাপড় রাধে নিল কানাইর বাঁশি নাই।
বাঁশিটি হারায়ে কানাই যায়রে গোয়াল পাড়া,
ঘরে ঘরে জিজ্ঞাস করে– বাঁশি নিছিস তোরা?
বাঁশিটি হারায়ে কানাই যায় রে মালী পাড়া,
ঘরে ঘরে জিজ্ঞাস করে– বাঁশি নিছিস তোরা?

আমরা তো লেই নাই বাঁশি লিতে দেখেছি,
আঁচলে ঢাকিয়া বাঁশি নিছে তোর মামী।
ভাল মানুষের ঝিরে মামী, ভাল মানুষের ঝি,
ভাগনের হাতের মোহন বাঁশি তুমি করবে কি?...
হুঁকা দে মা কলকে দে মা লড়ি দে মোর হাতে
গো-ধেনু চরাইতে যাব দাদা বলাইর সাথে।
(কোরাস) : মাধব সুখে রাখিও ধেনু কি জাগ হে।[১৪]
(সুবল সুবল)।

জাগগানের পরিবেশনাকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। যথা:

১. সোনাপীরের আসন স্থাপন
২. সোনাপীরের ভক্তি
৩. বন্দনা
৪. গানের কথামুখ
৫. কোরাস
৬. মান কাটাকাটি
৭. লাঠিখেলা ও ছায়াযুদ্ধ
৮. মিলন
৯. মাঙন

ক. বন্দনা :

জাগগানের শুরুতে বন্দনা পর্বটি খুবই অর্থবহ। বন্দনায় স্রষ্টা, নবী, পীর, দেবতা, হিমালয় পর্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ প্রভৃতি প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়। নিম্নে বন্দনার মধ্য দিয়ে সোনা রায় বা সোনাপীরের জন্মসংক্রান্ত একটি জাগের দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো। যথা:

উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
পশ্চিমে বন্দনা করি মক্কা কাবার ঘর
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীর নদী-সাগর
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর।

সোমে দাঁড়া মঙ্গলে নাভি বুধবারে বুক
বিষ্যুদবারে গড়ছে ছেলের পৃষ্ঠ আর মুখ
শুক্কুরবারে গড়ছে ছেলের সুখের দু'টি আঁখি
শনিবারে গড়ছে ছেলের সোনাই দমের কান
সেই কানেতে শোনে ছেলে আল্লা-নবীর নাম
রবিবারে গড়ছে ছেলের রবিযোগের মাথা
থাপিত করিয়া জান বসাইল তথা
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর।[১৫]
...
উত্তর থাইকা আইলোরে এক বামুন আর বামনী
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
পাতা জলে নাইমা বামনী পাতা মাঞ্জন করে
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
হাঁটু জলে নাইমা বামনী হাঁটু মাঞ্জন করে
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
উড়াত জলে নাইমা বামনী উড়াত মাঞ্জন করে
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
মাঞ্জা জলে নাইমা বামনী মাঞ্জা মাঞ্জন করে
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
বুক জলে নাইমা বামনী বুক মাঞ্জন করে
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
গলা জলে নাইমা বামনী গলা মাঞ্জন করে
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
চান্দি জলে নাইমা কন্যা দিল পঞ্চ ডুব
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
পঞ্চ ডুবও দিয়া বামনী ধুলফুলি ধরিল
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
ধুলফুলি ধরিয়া বামনী আঁচলে বান্ধিল[১৬]
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
আঁচলে বান্ধিয়া বামনী বাড়িতে আসিল
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর

বাড়িতে আসিয়া বামনী বাটিয়া খাইলো
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
একও মাসের কালে লোকে জানে কি না জানে
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
দুইও মাসের কালে লোকের কানে কানে
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
তিনও মাসের কালে লহু দলা দলা
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
চাইরও মাসের কালে হাড়ে সঞ্চে জোড়া
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
পঞ্চ মাসের কালে পঞ্চফুলও ফোটে
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
ছয়ও মাসের কালে ইযক ফুলও ফোটে
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
সাতও মাসের কালে সাধ খাইতে মূল
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
আটও মাসের কালে অষ্ট অলংকার
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
নয়ও মাসের কালে নমে গুণে তিথি
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
দশও মাসও দশদিন পূর্ণ হয়্যা গেল
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
উদরে থাকিয়া পীর রে ভাবিতে লাগিল
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
সকল পীরের দাই আসে হাঁটিয়া হাঁটিয়া
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
সোনাপীরের দাই আসে পালকীতে বসিয়া
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
কালের বান্ধন কাইটা দাইরে ঘরেতে ঢুকিল
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
বিষের লাড়ি ধইরা ছেলের মারে বজ্র টান

জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
মলাম মলাম মলাম মাওরে খাকিতে টলিয়া
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর
দাইয়েকে উপহার দিবে লক্ষ টাকার হাড়
জিন্দা সৈয়দও ওরে জিন্দা মানিকও পীর।[১৭]
(সুবল সুবল)

খ. জাগগানের দল : কেস স্টাডি

সাধারণত সাত থেকে দশ-বারো জন সদস্য নিয়ে জাগগানের দল গঠিত হতো। প্রত্যেক দলে একজন করে দলনেতা থাকতেন, তিনিই প্রধান এবং মূল গায়েন। জাগগানের দলের প্রত্যেক গায়েনকে চলনবিল অঞ্চলে বলা হতো খেরু। গানের দলে যিনি প্রধান গায়েন থাকতেন, তাকে বলা হতো মূল খেরু। মূল খেরু গানের ধুয়া বা মূল পয়ার গেয়ে উঠতেন, খেরুগণ নেচে নেচে হাতে তালি দিয়ে ডান পা সামনে এবং পেছনে নিয়ে সারিবদ্ধ, অর্ধবৃত্তাকার বা বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে মূল খেরুর কথার পুনরুক্তি করতেন। কখনো তাদের হাতে থাকত লাঠি এবং হারিকেন। সোনাপীর, মানিক পীর কিংবা সোনা রায়কে অভিন্ন জ্ঞান করেন তারা। পীরের প্রতিকৃতিতে আলোকসজ্জা এবং রঙিন ঝালরযুক্ত রাংতা, কাপড় কিংবা কাগজ শোভা পেত। অতীতে চোর-ডাকাতের দৌরাত্ম্য থেকে গৃহস্থকে সজাগ করার জন্য গ্রামের যুবক সম্প্রদায় পৌষের শীতের রাতে জেগে থেকে গ্রামের পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে চাল, ডাল, লঙ্কা প্রভৃতি মাঙতে মাঙতে সাধারণত এই গান গাইতেন। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মাঝেই জাগগান বিপুল সমাদৃত। সাধারণত গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘুরে এই গান গাওয়ার রীতি। জাগগানের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট মঞ্চ বা আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের দরকার হয় না। গায়েনদের পোশাকেও বিশেষ কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। মূল গায়েন লাল গামছা দিয়ে মাথায় পাগড়ি পরে থাকেন। সকল গায়েনই এক রঙের জামা, পাঞ্জাবি, হাতাওয়ালা গেঞ্জি কিংবা সাদা লুঙ্গি পরতে পছন্দ করেন। গলায় একটি গামছা বা উত্তরীয় ঝোলানো থাকলে বাড়তি আকর্ষণ তৈরি হয়।[১৮]

মাধব সুখে রাখিও ধেনু কি জাগ হে'
মোষ আইলোরে মোষ আইলো
ঘর-দুয়ার ভাঙ্গিতে আইলো
ঘর-দুয়ারের মচমচি

বুড়া-বুড়ির খুঁচখুঁচি।
ও বুড়ি তোর ভাঙ্গবে দাঁত
কাল ফুরাবে পৌষ মাস।
পৌষ মাসের একাদশী
বাড়ি বাড়ি চন্দন ঘষি।
চন্দন প'ল ফোঁটা ফোঁটা
এক বুড়ির সাত বেটা।
.....ইত্যাদি
সুবলরে ভাই সুবল সখী
আশ-পাশ মলন জুরি,
আশ-পাশ খোয়ারে থুয়্যা
চড়া বেড়াই ধাপ দিয়া
আয়রে চড়া লড়িয়া
হস্তীর পিঠে চড়িয়া,
হস্তী দুল দুল করে
তারি উপর খয়রা পড়ে
খয়রারে ভাই অমশুয়া
আমার খেরু খায় গুয়া
গুয়া খায় গুয়াতে মন
পান্তা ভাতে মাগে নন।
পান্তা ভাত হলবলায়।
আমার খেরু ঝুল খেলায়।
ঝুল খেলতে লাগল ঘোর
কে কে যাবে পেরেমপুর?
পেরেমপুর পাঁচ পাড়া
তিন ছয় আঠারো ঘোড়া।
ঘোড়া ঘুড়ি মারা দিলাম
তীর গোটা দুই ছাড়্যা দিলাম।
একটা তীরের ঘাচি মুচি
ওহে মাধবের ঝি –
ঘরে বইস্যা কর কী?

সোনার লাঙ্গল বাধিতাচি
সোনার লাঙ্গল রুপার ফাল
গাই-বলদে জুড়ছি হাল
হাল তোল ফাল তোল
সোনার লড়ি চালে তোল
বউ মার শোলা দিয়া
শোলা যখন ভাঙলো
চেংড়া বউ হাসল।
সুবল, সুবল ॥[১৯]

অতীতে চলনবিলের প্রতিটি গ্রামেই জাগের দল ছিল বলে শ্রুত হয়। এমনকি এক গ্রামের জাগের দলের সাথে অন্য গ্রামের জাগের দলের বাহাস চলত। কোন গ্রামের সোনাপীর কত আকর্ষণীয়, তা নিয়ে চলত প্রতিযোগিতা। নিজ দলের প্রতিটি সদস্যকে উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা এবং চাতুর্যপূর্ণ প্রশ্নোত্তর চর্চার প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তুলতেন প্রধান গায়েন। বর্তমান প্রাবন্ধিক কৈশোর এবং বাল্যকালে নিজ গ্রাম এবং পাশ্ববর্তী গ্রামে অনেকগুলো জাগের দল দেখেছেন। বিগত ৩০-৩৫ বছরের মধ্যে কোনো গান শোনা যায়নি। আশেপাশে কোথায় জাগের দল আছে, এমন সংবাদ চেষ্টা করেও পাওয়া সম্ভব হয়নি। নিজ গ্রাম শ্রীপুরে একটি দল ছিল, আবদুল কাদের ছিলেন সে দলের মূল গায়েন। তাঁর এখন বয়স হয়েছে। গত শতাব্দীর শেষপ্রান্তে (১৯৯৮-৯৯) ফোকলোর বিভাগে অধ্যয়নকালীন তাঁকে অনেক বুঝিয়েও গান গাইতে সম্মত করানো যায়নি। ২০১৪ সালে ফোকালোর বিভাগের ৬০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে চলনবিলে ফিল্ডওয়ার্ক পরিচালনা করা হয়। ১০ দিনের জন্য ক্যাম্প স্থাপন করা হয় খুবজীপুর হাইস্কুলে। নাটোরের সাংস্কৃতিক সংগঠক মো: মিজানুর রহমানের আয়োজনে আবদুল কাদেরর নেতৃত্বে বাউল ইমান আলীসহ দল গোছানো শুরু হলো। বাউল ইমান আলী এখন গান নিয়েই থাকেন। আবদুল কাদেরের জন্ম বাংলা ১৩৫১ সালে, পিতা মরহুম জামাল মুন্সী, গ্রাম শ্রীপুর। তাঁর ওস্তাদের নাম আহম্মদ আলী মোল্লা। পিপলা গ্রামের কারিগরপাড়ায় তিনি বাস করতেন। আবদুল কাদেরের সাথে আগে গান করতেন রবিউল মুন্সী এবং খলিল আকন্দ। খলিল আকন্দসহ আগের অনেক গায়েনই প্রয়াত। আ. রশিদ, পিতা মোজাম্মেল হক; জহুরুল শাহ, পিতা মৃত মোহাম্মদ আলী শাহ; আমজাদ, পিতা মৃত জমির বেপারী; জালাল, পিতা নজির

প্রাং; দুলাল, পিতা নজির প্রাং প্রমুখকে নিয়ে তিনি গান করতেন। সকলেরই নিবাস শ্রীপুর গ্রামে। এঁদেরকে নিয়ে নতুন করে দল গঠন হলো:

১. আবদুল কাদের/ পিতা: মৃত জামাল মুন্সী – মূল খেরু
২. আমজাদ হোসেন/ পিতা: মৃত জমির প্রাং – খেরু
৩. জহুরুল শাহ/ পিতা: মৃত মোহাম্মদ আলী শাহ – খেরু
৪. দুলাল প্রং / পিতা: মৃত নজির প্রাং – খেরু
৫. জালাল প্রাং / পিতা: মৃত নজির প্রাং – খেরু
৬. সামাদ শেখ / পিতা: মৃত ফজের শেখ – খেরু
৭. সরোয়ার শেখ /পিতা: মৃত শমসের শেখ – খেরু
৮. বাউল ইমান আলী খাঁ/ পিতা গোলাম মোস্তফা খাঁ – খেরু
৯. আসাদুজ্জামান মণ্ডল / পিতা: মৃত জানমোহাম্মদ মণ্ডল – খেরু

সিংড়া এবং চাটমোহর থেকে এলো লাঠিয়াল দল, জাদুশিল্পী, তলোয়ার খেলোয়াড়, সড়কি চালক, শিশু লাঠিয়াল। সরদার আব্দুল হামিদ কমপ্লেক্সে তৈরি হলো লাঠিখেলার প্যান্ডেল। একের পর এক লাঠিয়াল দলের প্রতিযোগিতা চলল। শিশু লাঠিয়ালদের উড়ন্ত লাঠিখেলার দক্ষতা ঢাকের তালে তালে চোখ ধাঁধিয়ে দিল দর্শকদের। বিঘ্ন ঘটাল দুপুরের মুষলধারায় বৃষ্টি। বিকেলের বর্ষাস্নাত মাঠেই হাজারো দর্শকের হর্ষধ্বনিতে চলল লাঠি এবং অন্যান্য খেলা। সন্ধ্যায় সোনা রায়ের প্রতিমূর্তি নিয়ে উপস্থিত হলো নবগঠিত জাগগানের দল। কোনো প্রকার লিখিত স্ক্রিপ্ট ব্যতিরেকেই অবিশ্বাস্যভাবে স্মৃতি থেকে একের পর এক জাগ গেয়ে তাঁরা বিমুগ্ধ করলেন। দর্শক ফিরে পেল ৩৫ বছর আগের বিস্মৃতপ্রায় জাগগান।

গ. জাগের মাঙন

জাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মাঙন। ফোকলোর গবেষক সরদার এম এ হামিদের বর্ণনামতে, 'প্রতি বছর পৌষ মাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গ্রামের তরুণ ও যুবকেরা দল বেঁধে হিন্দু-মুসলমানের বাড়ি গিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা মাগত। দু-তিন হাত লম্বা একটি কঞ্চি বা যষ্টির মাথায়ও গায়ে কাটা পাট সুতা দিয়ে বেঁধে সোনা রায়ের প্রতীক তৈরি করা হয়। অনেকেই লাল-নীল নানা প্রকার রঙিন কাগজে মোড়ায় এবং পাটের ফুলগুলোকে বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত করে। প্রত্যেক দলের এক-একটি করে সোনা রায় (প্রতীক) থাকে। এই দলকে বলে সোনা রায়ের দল। সোনাপীর এবং সোনা রায় অভিন্ন ব্যক্তি। হিন্দু ও মুসলমান

উভয় সমাজে সমান সমাদৃত তিনি। সোনা রায়ের গান গেয়ে পুরো পৌষ মাসে যে চাল, ডাল, পেঁয়াজ, আলু, রসুন, মসলা আদায় হতো তা দিয়ে পৌষসংক্রান্তির দিনে ছেলেরা শিরনি পোলাও করে গ্রামবাসীর মধ্যে বিতরণ করত। মাঙার গানের মধ্যে ছেলেরা সোনাপীর, মানিকপীর, কালু, গাজী, চম্পাবতী, মাদারপীর, নিমাই সন্ন্যাস, কেশব সাধু প্রমুখের প্রশংসাসূচক স্তুতি গেয়ে ভিক্ষা করত। পৌষসংক্রান্তিতে ছেলেরা উল্লাস করে ১ মাঘ নদীতে গোসলে নামত এবং এবং গোসল শেষে শিরনি রান্না করত। সোনা রায়ের গানের দলের সদস্যরা খেরু নামে পরিচিত। দলের প্রধানকে বলা হয়ে থাকে মূল খেরু। মূল খেরু গানের প্রধান অংশ গায়, সহকারীরা কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করে মূল গায়েনের সাথে সাথে গেয়ে পুরো গানটি শেষ করে। যথা:

আসলোরে লাল শালিকা
পায়ে দিয়া মোজা
ত্যালের হাঁড়িত ডুব দিয়া
ফ্যাচকা[২০] হলো রাজা।
ফ্যাঁচকা উঠিয়া বলে–
হামতো বড়ো জানি
তিরভুবনের পাখিরে
টেনে তোলো পানি
যা রে যা পাখি রে
চালে করে বাসা
কর্মের কপালের দোষে
খাইট্যা মরে চাষা।
চাষাগারে কামাইরে ভাই
খায় বড়ো বড়ো লোক
খায় আর দায়রে
মোছ মুচ দাড়ি
উচিত কথা কইলে পড়ে
দেয় লাকড়ির বাড়ি;
লাকড়ির বাড়ি যেমন তেমন
কঞ্চির বাড়ি দড়ো
আল্লাহর আলেমের ভিখ

এই বাড়ি জড়ো।
সুবল সুবল।[২১]

সরদার মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের ভাষায়, 'মাঙ্গার গান বা সোনাপীরের গান চলনবিল অঞ্চলের লোকসাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে কতিপয় যুবক ও তরুণ মিলে সোনা রায়ের দল গঠন করে রাত্রিকালে বিভিন্ন গ্রামের হিন্দু-মুসলমান বাড়ী গিয়ে গান গেয়ে সাহায্য ভিক্ষা মাঙ্গে। কোন বাড়ীর লোক চাল কেউবা পয়সা দিয়ে থাকে। কোন অতীত হ'তে এই প্রথা চলে আসছে তা জানা যায় না। দু'তিন হাত লম্বা একটি কঞ্চি বা যষ্টির মাথায় ও গায়ে কাটা পাট, তা দিয়ে বেঁধে সোনা রায়ের প্রতীক তৈরী করা হয়। অনেকেই যষ্টিটিকে লাল, নীল নানা প্রকার রঙ্গীন কাগজে মোড়ায় এবং পাটের ফুলগুলোকেও বিভিন্ন রঙ্গে রঞ্জিত করে। প্রত্যেক দলের এক-একটি সোনা রায় (প্রতীক) থাকে। এই দলকে বলে সোনা রায়ের দল। সোনা রায়কে সোনাপীরও বলা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে সোনাপীর 'জংলী পীর' নামে পরিচিত। ঘর বাড়ীতে বাস না করে ফকির হিসেবে বনে জঙ্গলে বাস করায় সোনাপীর হয়তো তৎকালীন লোকদের কাছে 'জংলী পীর' নামে সমধিক পরিচিত হ'য়ে উঠেন'।[২২] গ্রামে একাধিক দল থাকলে তাদের মধ্যে বচসা হয়। পরস্পরের মধ্যে তীব্র বাগযুদ্ধ শুরু হয়। এই বাগযুদ্ধে একে অন্যের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। যথাযথ প্রশ্নোত্তর করতে না পারলে জয়ী পক্ষ বিজিত পক্ষের সোনা রায়ের প্রতীকটি নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নেয়। অনেক সময় দর্শকের মাঝে আকর্ষণ তৈরি করার জন্য গায়েনরা তীব্র লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন এবং পরিশেষে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে পরস্পর কোলাকুলি এবং মোসাবা করেন। আদায়কৃত চাল-ডাল উপকরণাদি একত্র করে পৌষসংক্রান্তি উপলক্ষে গ্রামের সকলকে নিয়ে শিরনি খাওয়ার আয়োজন করেন। এ উপলক্ষে লাঠিখেলা, তলোয়ার চালনা, বাজি খেলা, সড়কি খেলা প্রভৃতির আয়োজনও হয়ে থাকে।

পরস্পর প্রশ্নোত্তর পর্বটি মান কাটাকাটি নামে পরিচিত। মান কাটাকাটির জন্য দুটি দল মুখোমুখি হলে তা বেশ জমে ওঠে। দুইটি 'সোনা রায়ের দলের সাক্ষাৎ হলে তাদের মধ্যে মান কাটাকাটি শুরু হয়। এমনকি নদীর এক পাড় হতে অপর পাড়ের দলকে ডাকাডাকি করে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এবং উচ্চ স্বরে বা হাঁক ছেড়ে প্রশ্নোত্তর করেন। এই প্রশ্নোত্তর পর্বটি বেশ বুদ্ধির পরিচায়ক। উপস্থিত বুদ্ধিতে প্রতিপক্ষের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মাঝে বাকচাতুর্যের পাশাপাশি মেধারও স্ফুরণ

দেখা যায়। সমাজের সাধারণ বিষয়কে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করতে প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতার বুদ্ধির জুড়ি মেলা ভার। বাংলা লোকসাহিত্যে আলোচিত ধাঁধার সাথে এই মান কাটাকাটির বেশ মিল পরিলক্ষিত হলেও, এর রস এবং শ্রুতিমধুরতা ধাঁধার চেয়েও আকর্ষণীয়। এ ক্ষেত্রে মান কাটাকাটির সাথে ধাঁধার সূক্ষ্ম পার্থক্যটিও লক্ষনীয়। নিচে কয়েকটি মান ও তার উত্তর পরিবেশিত হলো:

মান: তোদের সোনা রায় আসলো বাড়িত
বাঁধলাম তাকে গরুর চাড়িত।
উত্তর: হাতে আছিল খাট্য ভাঙলাম চাড়ি
আমাগারে সোনা রায় বেড়ায় বাড়ি বাড়ি।
মান: পথে তোদের দিলাম ছাই
কোথা দিয়া যাবি তোদের সোনা রায় ভাই?
উত্তর: আসলো দখিনা বাতাস উড়লো ছাই
খুশিমনে চলে যাবে আমাগো সোনা রায় ভাই।
মান: লোটা গেল গড়াগড়ি কলসি হলো কাত
জুতায় করে পানি খাস তোরা কোন জাত?
উত্তর: লোটা গেল গড়াগড়ি কলসি হলো কাত
গেলাসে করা পানি খাই আমরা মুসলমান জাত।
মান: তোগারে সোনা রায় গেল হাঁইটা।
আমাগারে উঠান গরম ফাটা।
উত্তর: বাটা ভরা পান দাও, গাল ভর‍্যা খাই
উঠানখানা তুল্যা দাও, সিলাই দিয়া যাই।
মান: পৌষ মাসে পড়লো হিম
তোদের সোনা রায় ডুব পারে, দুরা আর কাছিম
উত্তর: পৌষ মাসের শেষে পুষণার দিন
আমাগারে সোনা রায় ডুব দেয়, নাইরে হিম।
মান: রাস্তার মইধ্যে ফেল্লাম খাইট্যা।
তোদের সোনা রায় মইরলে পেট ফাইটা
উত্তর: খাইট্যা পোড়ায়ে করলাম ছাই
কি কস রে বউয়ের ভাই?[২৩]

৫. জাগগানের বিষয়বস্তু

কখনো শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণ, কখনো নিমাই সন্ন্যাস, কখনো কেশব সাধু কিংবা পীর-ফকিরের মাহাত্ম্য, সমাজ, ইতিহাস, নরনারীর প্রেম প্রভৃতি হয়ে ওঠে এই গানের বিষয়। 'জ্যৈষ্ঠ আর আষাঢ় মাসে ঝাঁকে চলে মাছ / রাধা গেল জল আনিতে কানাই নিল পাছ /(কোরাস) : তবে চল সখী সরোবরে জল আনিতে যাই'।

নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকেও চলনবিল অঞ্চলে এই গানের বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল। চলনবিল অঞ্চলে প্রচলিত কালু-গাজীর জাগটিতে 'সোনাপীর ও মানিক পীরের নাম উল্লেখ থাকায় ধারণা করা হয় তারা দুই ভাই লোক সৃষ্টির সোনা পীর ও মানিক পীর। তবে, এই চরিত্রগুলো লোকসমাজের কল্পনাপ্রসূত সৃষ্টি এ সম্পর্কে সকলেই মোটামুটি একমত। প্রচলিত সোনাপীরের মাঙ্গার গানের মাধ্যমে জানা যায়, সোনাপীর ও মানিক পীর দুই ভাই ছিলেন। তাঁরা উভয়েই ছিলেন আল্লাহর পথের ফকির বা সাধক। তাদের জাতিত্ব সম্পর্কে মতভেদ আছে। হিন্দু সম্প্রদায় সোনাপীরকে 'সোনা রায়' নাম দিয়ে তাকে হিন্দু বলে দাবি করেন। মুসলমানদের দাবি 'সোনাপীর' ও 'মানিক পীর' দুই ভাই-ই মুসলমান ছিলেন। মাঙ্গার গানের মধ্যে কালু-গাজী' দুই ভাইয়ের আখ্যানপট দৃষ্টে মনে হয় তাঁরাই দুই ভাই যথাক্রমে সোনাপীর ও মানিক পীর নামে পরিচিত ছিলেন। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে তাদের সোনা রায় ও মানিক রায় নামের হেতু কি? কালু-গাজী-চম্পাবতীর কেতাবে পাওয়া যায় কালু-গাজী বৈরাট নগরের সেকেন্দার বাদশাহর পুত্র ছিলেন। তারা রাজ্য-পাট ত্যাগ করে আল্লাহর পথের ফকির হ'য়ে বেরিয়ে পড়েন। ছোট ভাই গাজী (মানিক) শ্যামনগরের রাজা দক্ষিণরায়ের কন্যা চম্পাবতীকে বিবাহ করেন। দক্ষিণা রায়ের জামাতা হবার কারণেই হয়তো তৎকালীন হিন্দু সমাজ তাকে চলনবিলের লোকসাহিত্যে মানিক রায় বলেছেন, আর তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সোনাপীর (কালু) সোনা রায় হয়ে উঠেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, 'সত্য পীরের মতন মানিক পীর ও কালু-গাজীও হিন্দু-মুসলমানের উপাস্য মিশ্র দেবতা।[২৪] সুতরাং তার মতে, সোনা পীর ও কালু-গাজী পৃথক ব্যক্তি ছিলেন। মাঙ্গার প্রথা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের একটি সাধারণ আচার। চলনবিল অঞ্চলে মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ছেলেরাই অধিক মাঙ্গতে যায়, হিন্দু ছেলেরা খুব কমই মাঙ্গতে বের হয়। পৌষ মাসে সন্ধ্যায় খাওয়াদাওয়া শেষ করে সোনা রায় হাতে বিভিন্ন দল ভিক্ষা করতে বেরিয়ে পড়ে। এটা তাদের কাছে

শখের কাজ বা খেলা বিশেষ। একে পল্লীর একটি আচার বা অনুষ্ঠানও বলা চলে। পৌষ মাসের হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যে তারা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে গোটা মাস ভিক্ষা করে যা পায় তাই দিয়ে পৌষসংক্রান্তির শেষ রাতে অর্থাৎ ১ মাঘ অতি প্রত্যুষে 'পুষণ বা 'পুষুরা' করে। পুষণাকালে তারা হৈ হুল্লোড় করে নদীতে গোসল করে। তারপর আগুন জ্বালিয়ে গা, হাত, পা গরম করে । তৎসঙ্গে ভিক্ষালব্ধ। চাল ও অর্থে কেনা আতপ চাল, দুধ, গুড়, মসলা, নারকেল দিয়ে ক্ষীর রান্না করে নিজেরা খায় ও বিতরণ করে। কিছু অর্থ বেচে গেলে দলের খেরুরা ভাগ করে নেয়। দলের প্রত্যেককে 'খেরু' বলে। তাদের যে নেতা তাকে বলে 'মূল খেরু'। মাঙ্গার জন্য সোনা রায়ের দল কোনো বাড়িতে উঠে প্রথমে বলে "ছত্তর, ছত্তর সোনা রায়ের বর এলো বত্তর অন্তর।" প্রথমে "ছত্তর ছত্তর' আসলে সত্বর, সত্বর কিন্তু গ্রাম্য উচ্চারণে ছেলেরা অর্থ না বুঝে বলে, "ছত্বর, ছত্বর। তেমনি 'বৎসর অন্তর' স্থলে বলে 'বত্তর অন্তর'। অতএব, বাক্যটির অর্থ দাঁড়াচ্ছে তাড়াতাড়ি (ভিক্ষা দাও), সোনা রায়ের বর এক বৎসর পর এসেছে। এখানে 'বর' অর্থে প্রতিনিধি, বরপুত্র বা আশীর্বাদপুষ্ট দল। পরে তারা মাঙ্গার গান বা জাগ গায়। মাঙ্গার জন্য যে সকল গান পাওয়া হয়, তা বিশেষ ধরনের গান। একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই এগুলো ব্যবহৃত হয়। অন্যত্র হাটে, মাঠে, বাটে বা অন্য সময়ে কেউ মাঙ্গার গান গায় না। মূল খেরু প্রথমে গান ধরিয়ে দেয়, তারপর অন্যেরা একসঙ্গে (কোরাস করে)। সেই ছত্রই গায় বা তাদের জন্য নির্ধারিত কোরাস বা ধুয়া গায়।

অধ্যক্ষ এম এ হামিদ প্রণীত *চলনবিলের লোকসাহিত্য* গ্রন্থ থেকে কিছু গানের দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো। চলনবিল অঞ্চলে বর্তমানে এই গানগুলোই প্রচলিত রয়েছে। দীর্ঘ দিন চর্চা না থাকলেও যখন চাষিরা এই গান গেয়ে ওঠেন, তখন তারা সম্পূর্ণ স্মৃতি থেকেই বলে যেতে পারেন। তবে, কিছু কিছু চরণে শব্দ পরিবর্তন বা নতুন শব্দ তাৎক্ষণিক যুক্ত করার প্রবণতাও লক্ষণীয়। যথা:

ও পাড় দিয়া কেশব সাধু নৌকা বয়ে যায়
এ পাড় হতে পীর গাজী ডাক ছাড়িয়া কয়।
(কোরাস) মাধব সুখে রাখিও ধেনু কি জাগ হে।[২৫]
টাকা নাইরে টাকা নাইরে
টাকা বানাইলো কোম্পানী
টাকার পিঠে লেখা আছে
বিবি মহারানি।[২৬]

পার করো হে কেশব সাধু পাড়ে যাব আমি
সোনাপুর মসজিদে গিয়া নামাজ পড়ব আমি
গাছতলার ফকির তুই রে গাছতলা তোর বাসা
আমার নৌকায় পা দিবি তুই এতই করছিস আশা।
এই কথা শুনিয়া পীরের বড়ই রাগ হলো,
হবন পবন বল্যা পীর ডাকিতে লাগিল।
ডাক শুনিয়া হবন পবন আইস্যা খাড়া হলো ।
শোন দুই ভাই হবন পবন, আমার বাক্য ল্যাও,
কেশব সাধুর সপ্তডিঙ্গা সাগরে ডুবাও।
উত্তরে লাগায় মেঘ দক্ষিণে চলে বাও
তাই দেখিয়া কেশব সাধুর চমকে উঠে গাও।
পুবেতে লাগায় মেঘ পশ্চিমেতে ঝরে,
কেশব সাধুর সপ্তডিঙ্গা ডুবিল সাগরে।।
মাধব সুখে রাখিও ধেনু কি জাগ হে।[২৭]

উদ্ধৃত গানে সোনাপীর এবং কেশব সাধুর কথা পাওয়া যাচ্ছে। কেশব সাধু নৌকা বেয়ে যাচ্ছেন, গাজী পীর তার কাছে পার হতে চাইলেন। তিনি সোনাপুরে গিয়ে মসজিদে নামাজ পড়বেন। পীরের হাতে টাকা নেই। কেশব সাধু গাজী পীরকে গাছতলার ফকির বলে কটাক্ষ করলেন এবং পার করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন চলছে। কোম্পানি যে মুদ্রাব্যবস্থা চালু করেছে, তার ওপরে রানি ভিক্টোরিয়ার প্রতিকৃতি অঙ্কিত। পীরের মনে ক্রোধ জাগ্রত হলো। হবন, পবন দুই শিষ্য পীরের ডাকে উপস্থিত হলো। পীরের অভিশাপে সাধুর সপ্তডিঙ্গা সাগরে ডুবে গেল। অতঃপর কেশব সাধুর অনুরোধে সোনাপীর তার নৌকা জাগিয়ে দেন এবং পার হয়ে সোনাপুর মসজিদে যান। গানের কথার পুনরুক্তির মাধ্যমে অনেকক্ষণ ধরে গাওয়া হয়।

এক.
নন্দ গেল গাই বাথানে, দশরথ গেল ঘাটে,
খালি ভাণ্ডার পায়া বলাই সবই ননী লোটে।
(কোরাস) ও মা দয়া নাই রে তোর
মা হয়্যা বেটাক বলে, তুমি ননী চোর।
ননী খেল কে রে কিষ্ট ননী খেল কে?

আমি তো খাই নাই মারে বলাই খেয়েছে ।
ননী খেল কে রে বলাই ননী খেল কে?
আমি তো খাই নাই মারে, গোপাল খেয়েছে।
ননী খেল কে রে গোপাল ননী খেল কে?
আমি তো খাই নাই মারে কিষ্ট খেয়েছে।
এই কথা শুনিয়া মায়ের বড়ই রাগ হলো
গাভি বাধা ছান লিয়ে কিষ্টকে তাড়াল ।
আগে আগে যায়রে কি না দেখে উপায়
সামনে কদম্ব বৃক্ষ দেখিবারে পায়।
তোমায় বলি কদম্ব বৃক্ষ আমার অভীষ্ট লও
মা মোরে মারিতে আসে আমারে বাঁচাও।।
এই কথা শুনিয়া বৃক্ষের বড়ই দয়া হলো
মস্তক হেলান দিয়া বৃক্ষ তারে তুলে নিল ।
পাতায় পাতায় ঘোরে কিষ্ট ডালে না দেয় পা,
নিচে থেকে নন্দরানী ছুড়ে ছনের ঘা ।
নেমে আয়রে সোনার কিষ্ট পেড়ে দোব ফুল
ডাল ভাঙ্গিয়া পড়ে গেলে মজীবে দুই কুল ॥
শুলুবুলু[২৮] দিয়ে কিষ্টক গাছ হতে নামাল।
গাভি বাঁধা ছান দিয়ে দুই হস্ত বাঁধিল ।
কিবা বাঁধন বাঁধসে মাগো বাঁধনের কি জ্বালা
চেয়ে দেখ মা সোনার কিষ্ট হয়ে গেল কালা।
কালু বিহীন যাব মা ওরে রবি ঘোষের বাড়ি
মাজার গেট বন্ধক হয়ে দেব ননীর কড়ি।।
উত্তরে আছে মা ওরে ছালু ঘোষের বাড়ি
হাতের আংটি বন্ধক থুয়ে দেব ননীর কড়ি।
এই কথা শুনিয়া মায়ের বড়ই দয়া হলো।
ধুলা ঝেড়ে সোনার কিষ্টক কোলে তুলে নিল।
চলরে খেরুয়া ভাইরে অন্য বাড়ি যাই,
এ বাড়ীর মানুষ-গরুর বাড়ুকও পরমাই।
এক বাড়ির কাজ নারে ভাই, পাঁচ বাড়ি বেড়াই
নিপুতার হোক পুতুরে ডাকুক বাপ ও ভাই।[২৯]
(সুবল, সুবল)

ওপরের গানটিতে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর মায়ের কথার মধ্য দিয়ে চিরন্তন বাংলার মাতা-পুত্রের গৃহস্থ জীবনের ছবিই ফুটে উঠেছে। যার পুত্রসন্তান নেই, তার ঘরে পুত্র আসুক, যার গোয়ালে গরু আছে তা যেন সুস্থ সবল থাকে। এই কামনা থাকে গানের কথায়। গৃহস্থের কল্যাণ হোক, এই কামনার কথাগুলো হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মনের কথা। সোনা রায়ের গানের মাহাত্ম্য এখানেই।

দুই.

জ্যৈষ্ঠ আর আষাঢ় মাসে ঝাঁকে চলে মাছ
রাধা গেল জল আনিতে কানাই নিল পাছ।
(কোরাস) : তবে চল সখী সরোবরে জল আনিতে যাই।
রাধের কাপড় কানাইর বাঁশি রাখলো এক ঠাঁই,
রাধের কাপড় রাধে নিল কানাইর বাঁশি নাই।
বাঁশিটি হারায়ে কানাই যায়রে গোয়ালপাড়া,
ঘরে ঘরে জিজ্ঞাস করে– বাঁশি নিছিস তোরা?
বাঁশিটি হারায়ে কানাই যায় রে মালীপাড়া,
ঘরে ঘরে জিজ্ঞাস করে– বাঁশি নিছিস তোরা?
আমরা তো লেই নাই বাঁশি লিতে দেখেছি,
আঁচলে ঢাকিয়া বাঁশি নিছে তোর মামি।
ভাল মানুষের ঝিরে মামি, ভালো মানুষের ঝি,
ভাগনের হাতের মোহন বাঁশি তুমি করবে কি?...
হুকা দে মা কলকে দে মা লড়ি দে মোর হাতে
গো-ধেন চরাইতে যাব দাদা বলাইর সাথে।
(কোরাস) : মাধব সুখে রাখিও ধেনু কি জাগ হে,
'এ বাছা রহিলো কোন বনে।
হাম বলে রাখাল সবে খেদাইল পাল
পিছে পিছে যায় রে হাঁটি কালু আর গোপাল ॥
কতক দূরে যায়ে কালু ধেনু ছাড়্যা দিল,
ধেনু ছাড়া দিয়া দুই ভাই খেলা জুড়্যা দিল।
খেলিতে খেলিতে দুই ভাই ধেনুহারা হলো,
ধেনু হারাইয়া দুই ভাই খুঁজিতে লাগিল।
রাস্তা পথের পথিক ভাইকে পুছে ডাক দিয়া
তোমরা কি দেখেছো ভাইরে বাছুর-হারা ধেনু ।

উড়া যায় রে হংসরাজ পুছে ডাক দিয়া
তোমরা কি দেখেছো নাকি বাছুর-হারা ধেনু ।।
দেখেছি দেখেছি ভাইরে ক্ষীর নদীর তীরে
গলায় পবনের ঘণ্টা চলছে ধীরে ধীরে।
ধেনু[৩০]টি পাইয়া কানু মহা খুশি হলো।
হাসিতে হাসিতে দুই ভাই ঘরে ফিরা গেল।
আজিকার গরু রাখা মা বড়ই হয়্যাছে দুখ
পায় ফুট্যাছে উলুর গোজা, কাশে কাটছে বুক।।
আজকার মতো থাকরে বাছা মুখে কাঠি দিয়া
কাল সকালে তুলবে কাঁটা দুই চরণ ধুইয়া।
সুবল, সুবল।[৩১]

ওপরের গানটি নিছক দুই জন গরুর রাখালের ঘটনার মধ্য দিয়ে বাঙালির চিরন্তন পারিবারিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। উপমা হিসেবে এসেছে শ্রীকৃষ্ণ, বলাই কিংবা কালু চরিত্র, যা চিরকালের বাংলার অসাম্প্রদায়িক রূপকেই প্রকাশ করে।

তিন.

চতুরালীর চারখানি ঘর ঘন বাঁশের রুয়া
(কোরাস) : দেওয়ান সাজিল রে, দেওয়ান মানিক পীর।
আনিল কলমির ফুল কলমে কাটিয়া
এ ফুলেতে হলো নারে সোনাপীরের বিয়া।।
তারপর পাঠায় মামি ফন্সের লাগিয়া।
আনিল সোনার ফল শূন্য উড়ান দিয়া ।
আনিল জবার ফুল ডালিতে ভরিয়া।
এই ফুলেতে হয়ে গেল সোনাপীরের বিয়া।
সোনাপীর বিয়া করে যাচ্ছে মেলা দিয়া
পাড়াপড়শীর ঝি-বিটি পোছে ডাক দিয়া
সোনা রায়, সোনা রায়, দানে পালা কি?
এক ত' পেলাম ধুতি চাদর আর ত' পাব কি?
আরও পাছি থালা লোটা আর বা পাব কি?
শ্বশুরবাড়ির একটি কন্যা দানে পায়্যাছি।[৩২]
(কোরাস) : দেওয়ান সাজিল রে, দেওয়ান মানিক পীর।
জাগের এক লাইন মূল খেরু বলে, পরবর্তী লাইন সঙ্গীরা গায়।

চার.
এক মুঠা সরিষা, দুই মুঠা রাই
পালে আছে গোয়ালের গাই।
তার ফুটিক দুধ খাই,
তার মতন সুখ রে নাই।
দুধ ফুটিক নড়ে চড়ে
সাত রাখালে পড়ে মরে
সাত রাখালের সাতখান লড়ি
আমার হাতে একখান লড়ি।
একখান ভাইঙ্গা সাতখান করি
যম দুয়ারে খাড়া করি।
যম-দুয়ার অপকাপ
তাই দেখা ফোপায় সাপ।
অত সাপেক ডাক দিয়া
পয়সা লেব পাকি দিয়া ।[৩৩]
(কোরাস) : দেওয়ান সাজিল রে, দেওয়ান মানিক পীর।

পাঁচ.
নন্দ গেল বাথানে, দশরথ গেল ঘাটে
খালি ভাণ্ডার পায়্যা কিষ্ট সবই ননী লোটে।
কোরাস : ও মা দয়া নাই রে তোর
মা হয়ে বেটাক বলো, তুমি ননী চোর।।[৩৪]
রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনি নিম্নোক্ত গানটিতে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে :

ছয়.
জ্যৈষ্ঠ আর আষাঢ় মাসে ঝাঁকে চলে মাছ
রাধা গেল জল আনিতে কানাই নিল পাছ।
কোরাস : তবে চল সখী সরোবরে জল আনিতে যাই।।
–রাধের কাপড় কানাইর বাঁশি রাখলো এক ঠাঁই,
রাধের কাপড় রাধে নিল কানাইর বাঁশি নাই।
বাঁশিটি হারায়ে কানাই যায়রে গোয়ালপাড়া,
ঘরে ঘরে জিজ্ঞেস করে– বাঁশি নিছিস তোরা?
বাঁশিটি হারায়ে কানাই যায়রে মালীপাড়া,

ঘরে ঘরে জিজ্ঞেস করে– বাঁশি নিছিস তোরা?
আমরা তো লেই নাই বাঁশি লিতে দেখেছি,
আঁচলে ঢাকিয়া বাঁশি লিছে তোর মামি।[৩৫]
হুঁকা দে মা কলকে দে মা লড়ি দে মোর হাতে
গো-ধেনু চরাইতে যাব দাদা বলাইর সাথে।
কোরাস : মাধব সুখে রাখিও ধেনু কি জাগ হে
এ বাছা রহিল কোন বনে।।
হাম্বা বলে রাখাল সবে খেদাইল পাল
পিছে পিছে যায়রে হাঁটি কালু আর গোপাল।[৩৬]
কোরাস : মাধব সুখে রাখিও ধেনু কি জাগ হে।

৬. শেষ কথা

প্রতিকূল আর্থসামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যখন মানুষের জীবন হয়ে পড়েছে জটিল, পেশার পরিবর্তন, ধর্মীয় প্রভাব, পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, জীবিকার তাগিদ প্রভৃত কারণে জাগগানের প্রচলন নেই বললেই চলে। গায়কেরা আর আগের মতো গান করেন না। যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা দিতে পারলে এই ধারার গানকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব। মাঙনের গান যখন পৌষ মাসে রাত জেগে গাওয়া হয়, তখন তাকেই বলা হয়ে থাকে জাগগান বা জাকগান। চলনবিল অঞ্চলের লোকশিল্পীরা যে সকল জাগগান পরিবেশন করেন তার মাঝে বাউলগান, পালাগান, মারেফতি, বিচ্ছেদী প্রভৃতি গানের বিষয়বস্তুরও ছাপ পাওয়া যায়। একতারা, দোতারা, ডুগডুগি, ঢোল, হারমোনিয়াম, বাঁশি, কলসি প্রভৃতি দেশীয় বাদ্যযন্ত্র বাজিয়েই তারা চমৎকার সুর তোলেন। এককথায় বলা যায়, আড়ম্বরহীন আয়োজনে সর্বপ্রকার গানের সুর নিয়ে ভ্রাম্যমাণ শিল্পীরা যে সকল গান করে থাকেন, তা একদিকে যেমন তাদের জীবিকার মাধ্যম; অপরদিকে সর্বস্তরের গৃহস্থদের সামাজিক কল্যাণব্রতের কামনাপূর্ণ মনোরঞ্জনেও প্রভাব রাখে। বাঙালির জীবনে জাগগানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমেই কেবল এই গানের চর্চাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। প্রচার এবং প্রসারের ব্যবস্থা করলে এই গান জাতীয় সংস্কৃতির মূল্যবান উপাদান হয়ে উঠতে পারে। অন্যান্য সংগীত ও নানা বিষয়ে পারদর্শী গ্রাম্য শিল্পীদের ক্ষেত্রেও একই উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।

টীকা:

১ আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, (পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ) (কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৬২), পৃ. ২৭৯

২ GEORGE H. SCHOEMAKER, Introduction: Basic concepts of Folkloristics, *The Emergence of folklore in everyday life* (Bloomington: Trickster press, 1990, Indiana, USA), p.p. 7

৩ GEORGE H. SCHOEMAKER, Introduction: Basic concepts of Folkloristics, *The Emergence of folklore in everyday life,* Do, p.p. 4

৪ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, প্রথম খণ্ড।। অ–ন, সপ্তম সংস্করণ (কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমী, ২০০৮), পৃ. ৯৩৩

৫ বাংলা একাডেমী, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ২য় সংস্করণ (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯২), পৃ. ৪৬২

৬ আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলার লোকসাহিত্য*, তদেব, পৃ. ২৭৯

৭ রোহিণীকুমার সেন, *বাকলা* (বাকরগঞ্জের প্রত্নতত্ত্ব ও আধুনিক ইতিহাস, ১৯১৫), *বৃহত্তর বাকরগঞ্জের ইতিহাস* (২য় আনন্দধারা সংস্করণ), তপংকর চক্রবর্তী ও সিকদার আবুল বাশার (সম্পা.) (ঢাকা: আনন্দধারা, ২০১২), পৃ. ৬১

৮ W.W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal,* Vol. 1(London: Trubener & co, 1875), p.p. 159-163

৯ মো. আবদুল কাদের, গ্রাম : শ্রীপুর, ডাক : খুবজীপুর, উপজেলা : গুরুদাসপুর, জেলা : নাটোর। শিক্ষা: পঞ্চম শ্রেণি, পেশা: কৃষিকাজ। বিবি মহারাণী : মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

১০ মো. আবদুল কাদের, তদেব।

১১ W. W. Hunter.

১২ মো. মিজানুর রহমান, পিতা : মো. আ. সামাদ, গ্রাম : খুবজীপুর, গুরুদাসপুর, নাটোর, শিক্ষা: স্নাতক (বিপিএড), পেশা: শিক্ষকতা।

১৩ মো. আবদুল কাদের, তদেব।

১৪ তদেব।

১৫ মো. রিয়াজ উদ্দিন, পিতা: মৃত ছকের উদ্দিন ফকির, গ্রাম শ্রীপুর, ডাক: খুবজীপুর, গুরুদাসপুর, নাটোর। শিক্ষা: স্নাতকোত্তর, পেশা: উদ্যোক্তা।

১৬ মো. আবদুল কাদের, তদেব।

১৭ তদেব।

১৮ প্রকৌশলী মো. শাহাদৎ হোসেন মণ্ডল, গ্রাম: শ্রীপুর (ইসলাম কুটির), ডাক: খুবজীপুর, গুরুদাসপুর, নাটোর। শিক্ষা: স্নাতক (প্রকৌশল), পেশা: প্রকৌশলী।

১৯ মো. আবদুল কাদের এবং অন্যান্য।

২০ ফিঙে পাখি।

২১ সরদার মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, *চলনবিলের লোকসাহিত্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮১), পৃ. ৭৭।

২২ সরদার মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, পৃ. ৭৮

২৩ তদেব, পৃ. ৮১

২৪ দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎ *বঙ্গ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৭৮

২৫ মো. আবদুল কাদের, তদেব।

২৬ বিবি মহারাণী- মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

২৭ মো. আবদুল কাদের, তদেব।

২৮ মন ভোলানো ছলকথা।

২৯ সরদার মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, পৃ. ৮১

৩০ ধেনু –গাভি।

৩১ সরদার মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, পৃ. ৭৯

৩২ সরদার মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, *চলনবিলের লোকসাহিত্য* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮১), পৃ. ৮১।

৩৩ সরদার মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, পৃ. ৮১।

৩৪ সরদার মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, তদেব।

৩৫ তদেব।

৩৬ তদেব।

লেখক পরিচিতি: **ড. মো. আমিরুল ইসলাম**, সহযোগী অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

অস্তিত্বের সন্ধানে : টেস্ট অব চেরি

কাজী সালমান শীশ

সারসংক্ষেপ : ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন ও চেতনাকে কেন্দ্র করে *টেস্ট অব চেরি* (১৯৯৭) ভিন্ন আঙ্গিকে নির্মিত এক ইরানি চলচ্চিত্র। জাগতিক বিষয়ে আগ্রহ হারিয়ে আত্মহত্যার চিন্তায় আচ্ছন্ন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি বাদি। মাত্র একদিনের কাহিনির মধ্য দিয়ে পরিচালক দেখিয়েছেন জীবন কত মূল্যবান। প্রকৃতির মাঝে ছড়িয়ে রয়েছে বেঁচে থাকার উপাদান আর জীবন হচ্ছে অগণিত মুহূর্তের সমাহার। নেতিবাচক চিন্তা অনেক সময় মুহূর্তকে গ্রাস করে, তখন হাল ছেড়ে দিলে সবকিছু বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ছবিতে বাদি ভিন্ন তিন জাতির, তিন পেশার লোককে দায়িত্ব দিতে চান, তার আত্মহত্যা সম্পন্নের পর সমাধিস্থ করার জন্য। যাদের কাছে তিনি ইচ্ছাটা ব্যক্ত করেন তারা সকলেই সংগ্রামী, পরিশ্রমী এবং জীবনমুখী মানুষ। বাদির জীবন অপেক্ষাকৃত শান্ত ও মসৃণ, নেই শুধু মানসিক প্রশান্তি। তিনি জীবনের মুহূর্তগুলোকে সুন্দর করে গড়ে না তুলে তা থামিয়ে দিতে চান। কাহিনি অসমাপ্ত থাকলেও সংশয়গ্রস্ত বাদি তার চিন্তায় অনড় থাকেন। বেঁচে থাকার জন্য খুব বেশি কিছুর প্রয়োজন হয় না, সামান্য একটা মিষ্টি ফলের স্বাদই যথেষ্ট–এই বিষয়টা অনুভবে নিতে ব্যর্থ হন তিনি। পরিচালক আব্বাস কিয়ারোস্তামির মধ্যবয়সের ভাবনা ও দর্শন স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে চলচ্চিত্রটির মাধ্যমে।

মূল প্রবন্ধ : গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে এশিয়া তথা মধ্যপ্রাচ্যের ইরান থেকে আবির্ভূত হয় অনন্য এক চলচ্চিত্র *টেস্ট অব চেরি* (১৯৯৭)। পরিচালক আব্বাস কিয়ারোস্তামির (১৯৪০-২০১৬) নাম সারা পৃথিবীর কাছে প্রকাশিত হয় ফ্রান্সের কান চলচ্চিত্র উৎসবের মর্যাদাপূর্ণ *পাম দো'র (Palme d'Or)* পুরস্কার অর্জনের মাধ্যমে। ১৯৯৭ সালে তাঁর ছবি *টেস্ট অব চেরি* জিতে নেয় সম্মানজনক পুরস্কারটি। ইরানে নানাবিধ উৎকৃষ্ট ছবি তৈরি হলেও বিশ্ব ফিল্ম বোদ্ধাদের কাছে তা একরকম অজানাই ছিল, *টেস্ট অব চেরি* (১৯৯৭) স্বীকৃতি পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। পরিচালকের ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন প্রামাণ্যচিত্রের শৈলীতে প্রকাশ এই ছবির অন্যতম বিশেষত্ব। ছোট্ট একটি গল্প প্রদর্শন করেছে জীবন-মৃত্যু, সমাজ-রাজনীতি, কর্ম-বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও যুদ্ধোত্তর পরিবেশ। ইরানের রাজধানী তেহরানের নিকটস্থ মরুভূমি অঞ্চলের রাস্তাই ছিল পুরো ছবির পরিমণ্ডল, অথচ তা উন্মোচন করেছে বিশাল পরিসর। নিপীড়িত সমাজ গড়ে ওঠা, নগরায়ণের ছোঁয়া ও মানসিক ভারসাম্যহীনতা প্রতীকীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে একদিনের গাড়ি ভ্রমণের মাধ্যমে।

চলচ্চিত্রটির মূল বক্তব্য ও অন্তর্নিহিত দর্শন আলোচনার প্রারম্ভে এর আখ্যান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা নেওয়া যাক।

প্রধান চরিত্র বাদি। তিনি মধ্যবয়সী জীবন সংকটের মধ্য দিয়ে যাওয়া পঞ্চাশোর্ধ্ব একজন ব্যক্তি, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঘুমের ওষুধ সেবন করে স্বেচ্ছামৃত্যুর। তেহরানের সন্নিকটে রুক্ষ পাহাড়ি মরুভূমি অঞ্চল দিয়ে গাড়ি চালিয়ে বাদি এমন একজনকে খুঁজছেন যে তার আত্মহননের পর বিষয়টি নিশ্চিত করে তাকে সমাধিস্থ করবে। সাহায্যকারী পাবে ২০০০০০ টোমান (ইরানি মুদ্রা)। প্রথমে এক তরুণ কুর্দ সৈনিককে, তারপর একজন আফগান সেমিনারিয়ানকে (ধর্মীয় শিক্ষালয়ের ছাত্র) বাদি গাড়িতে তুলে প্রস্তাব করেন, কিন্তু তাঁরা উভয়ই কাজটা করতে অস্বীকৃতি জানান। অবশেষে একজন বয়স্ক তুর্ক ট্যাক্সিডার্মিস্ট কাজটির জন্য সম্মতি জানান। মৃত পশু-পাখির প্রতিমূর্তি তৈরি করা ট্যাক্সিডার্মিস্টের কাজ। লোকটার অর্থের প্রয়োজন তার অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসার জন্য। ট্যাক্সিডার্মিস্ট বাদিকে তার জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলেন– যুবক বয়সে বিয়ে করার কিছুদিন পর তিনি একবার আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। গাছে উঠে ফাঁস নেওয়ার ঠিক আগে মিষ্টি একটা মালবেরি ফল খেয়ে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়। সামান্য এক মিষ্টি চেরির স্বাদ তার জীবন ফিরিয়ে দেয়। লোকটির কথায় বাদি

আরো সংশয়গ্রস্ত হয়ে পড়েন, কিন্তু পরিকল্পনা পরিবর্তন করেন না। মেঘাচ্ছন্ন রাতে চাঁদের ক্ষীণ আলোতে বাদি তার নিজের খোঁড়া কবরে শুয়ে পড়েন। এরপর বিদ্যুৎ চমকানোর আলো তার মুখে এসে পড়ে। গল্পের পরিণতি অসমাপ্তই রয়ে যায়।

চিত্র-১ : চরিত্র বাদি গাড়ি চালাতে চালাতে কথা বলছেন

ছবির বেশির ভাগ অংশ চলমান গাড়ির ভেতর ও দূরবর্তী পাহাড় থেকে ধারণ করা। চারদিক নিষ্প্রাণ, পাথুরে ও কখনো ধুলায় আবৃত। বাদি তার রেঞ্জ রোভার গাড়ি থেকে দেখেন বহু মানুষ কাজের জন্য ব্যাকুল, যাদের অধিকাংশই দিনমজুর ও শ্রমিক। অভাবী লোকজন রাস্তার পাশে শারীরিক শ্রম বিক্রি করতে প্রস্তুত সামান্য অর্থ উপার্জনের জন্য। কেউ কেউ বাদির গাড়ির কাছে এসে জানতে চায়– 'শ্রমিক লাগবে কি না?' এখানে শুধু বাদিরই নির্দিষ্ট কোনো কাজ নেই, গাড়িতে বসে মানুষ পর্যবেক্ষণ করে যাওয়া ব্যতীত। একজন উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান তিনি করছেন কিন্তু খুঁজে পাচ্ছেন না। দরিদ্র মজদুর, আবর্জনা সরানোর লোক, পাথর ভাঙার ভারী যন্ত্র আর কড়া রোদে ঘেরা পরিবেশ।

চিত্র-২ : রুক্ষ পাহাড়ি মরুভূমি অঞ্চলের রাস্তায় সৈন্যরা দৌড়াচ্ছে (নিত্যদিনের ব্যায়াম)

অর্থনৈতিকভাবে বাদির সামাজিক অবস্থান অন্যদের থেকে ভিন্ন। তিনি একজন সচ্ছল ব্যক্তি। তার একটি রেঞ্জ রোভার গাড়ি, একটি অ্যাপার্টমেন্ট ও পরিবার রয়েছে। এছাড়া গাড়িতে তার সাথেই নগদ আছে ২০০০০০ টোমান। শিক্ষিত, রুচিশীল ও সংবেদনশীল একজন ব্যক্তি তিনি। চিন্তাধারার দিক থেকেও উন্নত। অভাব রয়েছে শুধু সুখ ও মানসিক স্থিরতার। তিনি হারিয়ে ফেলেছেন বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা। সবকিছুর পরও মধ্যবয়স্ক বাদির বিষণ্নতার কারণ স্পষ্ট নয়। ছবির শেষ পর্যন্ত তা অজানা থেকে গেলেও অনুধাবন করা যায় বেঁচে থাকার অভিপ্রায় সবসময় সামাজিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে না। মৌলিক চাহিদাসংক্রান্ত সকল অভাব পূরণের পরও হতাশা মানুষকে গ্রাস করতে পারে, যার চিহ্ন বহন করে ব্যক্তি বাদি।

কিয়ারোস্তামি তাঁর সাক্ষাৎকারে স্বেচ্ছামৃত্যুসংক্রান্ত বিষয়ে বলেন,

> "Have you read Omar Khayyam? The quatrains of this Persian poet and great scientist, written at the end of eleventh century and the early part of the twelfth, are a constant eulogy of life in the ever present face of death. In my film, in the same way, we could just have talked about death and left out the idea of suicide." (Elena, 2005, p.130)

ছবিটিতে মধ্যপ্রাচ্যের তিনটি ভিন্ন জাতির তিনজন তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্র রয়েছে– কুর্দ, আফগান ও তুর্ক। গাড়ি চালাতে চালাতে তাদের সাথে বাদির কথা হয় এবং

পৃথকভাবে বাদি তার প্রস্তাব জানান। সংক্ষেপে প্রস্তাবটি হচ্ছে– বাদি আত্মহত্যা করবে। আত্মহননের পর কোনো একজনকে বিষয়টি নিশ্চিত করে মাটি চাপা দিয়ে সমাধিস্থ করতে হবে।

প্রথমে বাদি গাড়িতে ওঠান একজন কুর্দ সৈনিককে। এরপর আফগান সেমিনারিয়ান এবং শেষ লোকটি বয়স্ক তুর্ক ট্যাক্সিড্রার্মিস্ট। তিনজনই প্রাত্যহিক জীবনে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন, কিন্তু তাঁরা কেউই নিজ পেশায় সন্তুষ্ট নন। তিন চরিত্রই তেহরানে কাজ করছে কারণ তাঁদের নিজ জন্মভূমির পরিস্থিতি অস্থিতিশীল। যুদ্ধের কারণে তাঁরা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। এতে মধ্যপ্রাচ্যের বড় একটি অংশের ভঙ্গুর বাস্তবতার ইঙ্গিত বহন করে। বাদি নিজ দেশে উন্নত অবস্থায় থেকেও মৃত্যুকে বরণ করে নিতে চাচ্ছেন, অপরদিকে তরুণ সৈনিক, যুবক ছাত্র ও বয়স্ক ট্যাক্সিড্রার্মিস্ট রুক্ষ দেশে এসে সংগ্রাম করে চলেছেন বাঁচার জন্য। গাড়িতে কথোপকথন হওয়ার সময় পাহাড়ের ওপর টপ শটে ধারণকৃত ছবি দেখে মনে হয় এই পথের কোনো শুরু বা শেষ নেই। পরিচালক কিয়ারোস্তামি একই রাস্তায় বারবার লং এরিয়াল শটে ভিন্ন ভিন্ন সংলাপে কথোপকথন উপস্থাপন করেন তিনজন ব্যক্তির সাথে। প্রথম দর্শনে শটগুলো পৃথক করা না গেলেও পরে কথার গভীরে প্রবেশ করলে তা ভিন্নমাত্রা স্পর্শ করে।

The Cinema of Abbas Kiarostami বইয়ে তিনি নিজেই বলেন,

> "In fact I wanted to the landscape, not to mention the light, the relationship between light and darkness, to reflect the character's state of mind." (Elena, 2005, p.129)

তরুণ কুর্দ সৈনিকের চরিত্র ও দর্শনে প্রকাশ পায় সততা ও দেশপ্রেম। জীবন ও পরিবার তার কাছে প্রিয় হলেও দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। অথচ সে শান্ত ও নরম স্বভাবের মানুষ। আচরণ, চেহারা, সর্বোপরি কথাবার্তায় বিন্দুমাত্র প্রতিহিংসা, লোভ ও দম্ভের ছাপ নেই। তরুণ সৈনিকটি আগে কৃষিকাজ করতেন। বাদি তার উদ্দেশ্যে নস্টালজিক কণ্ঠে বলেন, যার ইংরেজি সাবটাইটেল, "I had fun when I did my military service. It was the best time of my life. I met my closest friends there." (*Kiarostami, 1997, 00:17:54*) তরুণটিকে বাদি বেশ পছন্দ করেন এবং তার কাজের জন্য উপযুক্ত মনে করেন। বাদি তার ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তিমূলক কথাগুলো তাকে জানান। তরুণ প্রথম সুযোগেই বাদির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে পালিয়ে যান।

যুবক সেমিনারিয়ান ধর্মীয় রীতিতে বিশ্বাসী। আলাপচারিতার একপর্যায়ে তিনি বাদিকে বলেন, "God entrusts man's body to him. Man must not torment that body." (*Kiarostami, 1997, 00:50:36*) ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যা মহাপাপ এবং সেই কাজ করাটা সামাজিকভাবেও অন্যায়–এই কথা বাদিকে বোঝাতে গিয়ে তার সাথে বাদির চেতনার দ্বন্দ্ব দেখা যায়। মতের অমিল থাকায় তাদের মধ্যে শীতল তর্ক হয় যেখানে বাদি কিছুটা উত্তেজিত হয়ে কথা বলেন। আফগান যুবক ছাত্রটি আত্মহত্যা সম্পর্কে ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেন। এতে বাদি প্রতিক্রিয়া জানান, "I know that suicide is one of the deadly sins. But being unhappy is a great sin too. When you are unhappy, you hurt other people. Isn't that a sin too?" (*Kiarostami, 1997, 00:51:17*) বাদির মতে মানুষকে কষ্ট দেওয়া পাপ। বিচ্ছিন্ন কথোপকথনের এই অংশে মনে হতে পারে পরিচালক পরোক্ষভাবে আত্মহত্যাকে সমর্থন করছেন, যদিও ব্যাপারটার ব্যাখ্যা খুব সরলরৈখিক নয়। নানা ধরনের চিন্তার মধ্যে এটি মাত্র একটির প্রতিফলন। বাদি লোকটিকে আরো বলেন, "In any case, talking won't get us anywhere." (*Kiarostami, 1997, 00:52:33*) অ্যালবার্টো এলেনার *The Cinema of Abbas Kiarostami* বইয়ে সেমিনারিয়ান চরিত্রের উপস্থিতি ব্যাপারে লেখা হয়েছে:

> "Kiarostami himself admits that he included the character of the seminary student in order to pre-empt the predictable objections of the religious authorities by representing them in the film itself." (Elena, 2005, p.134)

চিত্র-৩ : তরুণ সৈনিককে বাদি তার খনন করা সমাধিস্থান দেখান

চিত্র-৪ : আফগান সেমিনারিয়ানের সাথে মতান্তর হয় বাদির

বয়স্ক ট্যাক্সিডার্মিস্ট সম্পূর্ণ ভিন্নরকম চরিত্র। ট্যাক্সিডার্মিস্ট প্রাণীর মৃতদেহকে প্রতিমূর্তি রূপ দেন। পাশাপাশি তিনি তেহরানে ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে কাজ করেন। লোকটি দৃঢ় ও মানসিকভাবে শক্ত একজন মানুষ। স্বচ্ছ চিন্তাধারা ও অভিজ্ঞতার বিচারে তিনি পুরো ছবিতে সবার থেকে সচেতন ব্যক্তি। তুর্ক বয়স্ক লোকটি বাদিকে স্পষ্ট জানান তিনি বাদির মৃত্যুর পর সমাধিস্থ করার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। লোকটি রাজি হয়ে যাওয়ায় বাদি আরো সংশয়ে পড়ে যান। এমনিতেই তিনি জীবন নিয়ে শঙ্কিত ও দ্বিধাগ্রস্ত।

তুর্ক ট্যাক্সিডার্মিস্টই একমাত্র লোক যিনি মনে অনিচ্ছা নিয়েও বাদির জন্য কাজ করতে রাজি হন। স্পষ্টবাদী লোকটি ব্যক্ত করেন যে তার সন্তান জটিল এক ব্যাধিতে আক্রান্ত। চিকিৎসার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই তিনি বাদির প্রস্তাবে রাজি। তবে বৃদ্ধই একমাত্র ব্যক্তি যিনি অজান্তে বাদির মধ্যে ক্ষীণ ইতিবাচক চিন্তার প্রবেশ করাতে পারেন। নিজের যৌবনের ঘটনা উল্লেখ করে বলেন যে, অনেক বছর আগে তিনিও জীবন থেকে পালাতে ব্যাকুল হয়েছিলেন। গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করতে গাছে ওঠেন। কিন্তু গাছে মালবেরি ধরে আছে দেখে তিনি মিষ্টি একটা ফল মুখে দেন। তাৎক্ষণিক তার সংবিত ফিরে আসে এবং জীবনকে সুন্দর মনে হয়। সামান্য চেরির স্বাদ তার জীবন রক্ষা করে। জীবনকে ভালোবাসতে শেখায়। বাদি তুর্কর যৌবনকালের আত্মহত্যা-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ও চেরির স্বাদের কথা শুনে বেশ বিভ্রান্তিতে পড়ে যান, যদিও সিদ্ধান্ত

পরিবর্তন করেন না। তুর্ক বাদির উদ্দেশ্যে আক্ষেপের সুরে বলেন, "Do you want to give up the taste of cherries?" (*Kiarostami, 1997, 01:12:54*) এই বাক্যটি চলচ্চিত্রের মূল দর্শনকে প্রতিফলিত করে। একজন ব্যক্তির সুস্থ মস্তিষ্কে বেঁচে থাকার জন্য খুব বেশি কিছুর প্রয়োজন হয় না। কেবল দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে পৃথিবীকে দেখলে জীবনে ইতিবাচক আলোর সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

চিত্র-৫ : তুর্ক ট্যাক্সিডার্মিস্ট জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন

টেস্ট অব চেরি (১৯৯৭) ছবিতে শটের সংখ্যা প্রচলিত পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমার তুলনায় অনেক কম। এর প্রধানতম কারণ সিনেমার কম বাজেট নয়, বরং লং টেকের অসাধারণ ব্যবহার। গুরুত্ববহ শট, ঘটনাপ্রবাহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেশি সময় ধরে শট ধারণ করলে তার প্রভাব বেশি পড়ে। দর্শক অনেকটা সময় পায় চিন্তা করার এবং একই সাথে ছবি দেখার। এই ছবির ক্ষেত্রে তা কতগুলো মিজ-অঁ-সিন সৃষ্টি করেছে। সেই বিচারে গত শতাব্দীর শেষভাগে আবার যেন নতুন মাত্রা নিয়ে এল লং টেকের ব্যবহার, যেরকম রবার্ট ফ্লাহার্টির কালজয়ী প্রামাণ্যচিত্র *নানুক অব দ্য নর্থ* (১৯২২)-এ দেখা যায়। কাহিনিচিত্র হলেও পর্যবেক্ষণধর্মী সেই প্রামাণ্যচিত্রের সাথে *টেস্ট অব চেরি* (১৯৯৭)-র কারিগরি দিক ও সৃজনশীলতার যথেষ্ট মিল রয়েছে। মিজ-অঁ-সিন নিয়ে *Film Art : An Introduction* গ্রন্থে যথার্থই উল্লেখ রয়েছে–

> "We should analyze mise-en-scene's fiction in the total film-how it is motivated, how it varies or develops, how it works in relation to other film techniques." (Bordwell and Thompson, 2010, p.119)

সংলাপ ব্যবহারেও ধরে রাখা হয়েছে ক্ল্যাসিক্যাল ভাষ্যরীতি। সেজন্য সিনেমায় দেয়া তথ্যগুলো খুব সহজেই গভীরভাবে মনে গেঁথে যায়। সংলাপগুলো সামাজিক ভাষ্য হিসাবে কাজ করে। পরিচালক নিজের মনের কথা ও জীবনের অভিজ্ঞতা অন্যের মাধ্যমে বলে যান, তা বোঝার অপেক্ষা রাখে না। নিজের লেখা ও পরিচালনা অর্থাৎ অঁতর ফিল্মমেকারের (Auteur Filmmaker) পূর্ণ ছাপ পাওয়া যায় *টেস্ট অব চেরি* (১৯৯৭)-তে। অপেশাদার অভিনেতাদের নিয়ে কাজ করা নতুন কিছু না, তবে তাদেরকে চরিত্রের মতো করে ছেড়ে দিয়ে অনেকটা ফ্রেঞ্চ নিউ ওয়েভ সিনেমার আঙ্গিকে কাজ করেছেন পরিচালক আব্বাস কিয়ারোস্তামি। যে কারণে চাকচিক্য এসে ছবির ভাবধারাকে নষ্ট করতে পারেনি। কৃত্রিমতা বিবর্জিত গণমানুষের ছবি হয়ে উঠতে পেরেছে *টেস্ট অব চেরি* (১৯৯৭)। বিখ্যাত মার্কিন চলচ্চিত্র সমালোচক জোনাথান রোসেনবাম কিয়ারোস্তামির সাথে ফ্রেঞ্চ নিউ ওয়েভ চলচ্চিত্র আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক জ্যাঁ লুক গদারের তুলনা করে লেখেন:

> "A somewhat comparable technique was used by Godard in the 1960s when he conveyed lines to actors or fired questions at them over small, invisible earphones." (Rosenbaum, 2003, p.30)

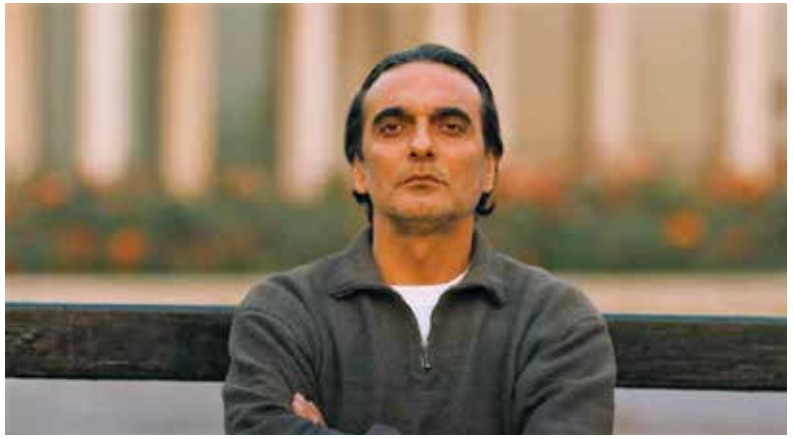

চিত্র-৬ : সন্ধ্যা নামার আগে রাস্তার ধারে বেঞ্চিতে একা বসে বাদি

টেস্ট অব চেরি (১৯৯৭) চলচ্চিত্রের অপরিহার্য একটি উপাদান প্রকৃতি, অপরটি হলো গাড়ি। চলমান গাড়িটি দেখানো হয় দুইভাগে–প্রথমত গাড়ির ভেতরের চরিত্র, যার অধিকাংশই প্রোফাইল শটে তোলা; দ্বিতীয়ত লং ও এরিয়াল দৃষ্টিকোণ থেকে চলন্ত গাড়ির দৃশ্য। ছবিতে একদিনের গল্প দেখানো হয়েছে, দিন থেকে শুরু করে মধ্যরাত পর্যন্ত। একদিনের ১২-১৪ ঘণ্টা বাস্তবিক সময়ের কাহিনি দেড় ঘণ্টায় উঠে এসেছে। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে, অর্থাৎ টাইম কম্প্রেশন করে মুখ্য চরিত্র নিয়ে ছবি বানালে তার পটভূমি সাধারণত সুনির্দিষ্ট থাকে। এই ছবিও তার ব্যতিক্রম না। সময় সংকোচনের একই রকম পদ্ধতি ব্যবহার করে, মৌলিক চিত্রনাট্যে *কাঞ্চনজঙ্ঘা* (১৯৬২) নির্মাণ করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। দার্জিলিং-এ বেড়াতে যাওয়া বাঙালি কয়েকটি পরিবারের খণ্ড খণ্ড গল্পে তিনি ব্যবহার করেছিলেন টেকনোকালার। বছরের পর বছর সময়ের গল্প, আর এক-দুই দিনের কাহিনিকে দেড়-দুই ঘণ্টায় পর্দায় ফোটানোর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন। সম্পাদনার ক্ষেত্রে চলমান সময়ের ধারাবাহিকতা এখানে পর পর ধরে রাখতে হয়। *টেস্ট অব চেরি* (১৯৯৭) ছবির অবস্থান তেহেরান শহরের কাছাকাছি মরুভূমি অঞ্চল, যেখানে সাধারণ মানুষ ও পর্যটক আসে না। মানুষের মনকে আকর্ষণ করার মতো উপাদান সেখানে নেই। শহুরে যান্ত্রিক সমাজ থেকে একটু দূরে নিয়ে পরিচালক কাহিনিটি দেখান। জগৎ-সংসার থেকে পালিয়ে থাকতে চায় এমন হাজারো মানুষের মতো একজন ব্যক্তি বাদি। কিয়ারোস্তামি তার সাথে অন্যদের দূরত্ব বজায় রেখে বিচ্ছিন্নতা ধরে রাখেন। যে তিন ব্যক্তির সাথে তার কথা হয় সকলের সাথেই তার বোঝাপড়ার ব্যবধান রয়েছে, যা একটু পরপর প্রাণের অনুপস্থিতি সৃষ্টি করে। চারিত্রিকভাবে বাদির স্বতন্ত্রতা প্রকাশ পায়।

চিত্র-৭ : একই রাস্তায় বারবার ঘুরছে বাদির রেঞ্জ রোভার গাড়ি

শেষ দৃশ্য বাদে পুরো সিনেমা দিনের সূর্যালোকে নির্মিত। সমাপ্তির সময় বাদি যখন অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হন এবং গাড়ি চালিয়ে কবরে শুয়ে পড়েন–শুধু সেই দুইটি দৃশ্য রাতে ধারণ করা। কবরের গহ্বরে তিনি শুয়ে থাকেন, বিদ্যুৎ চমকানোর আলো বাদির মুখে এসে পড়ে। ছবির আঙ্গিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ইনডোর ও সেটবিবর্জিত দৃশ্য। পরিচালক এড়িয়ে গেছেন কৃত্রিম মেকআপ ও আলোকসজ্জা। প্রাকৃতিক পরিবেশে সোনালি বর্ণের টোন মধ্যপ্রাচ্যের মরু আবহকে উপস্থাপন করে। মিউজিয়ামের অভ্যর্থনা কক্ষ বা বাদির অ্যাপার্টমেন্টের চিত্রও বাইরে থেকে ক্যামেরায় ধারণ করা। শুধু শেষ দৃশ্যে সামান্য কৃত্রিম আলোর ব্যবহার করা হয়েছে। বাদি চোখ বোজার আগে অর্থাৎ মূল ছবি শেষের আগ পর্যন্ত কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক নেই।

ইরানের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক পটভূমি *টেস্ট অব চেরি* (১৯৯৭) চলচ্চিত্রে সুপ্তভাবে লুকিয়ে রয়েছে। কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সাফল্য লাভের পর ছবিটি ইরানের কূটনৈতিক পরিমণ্ডলে সমালোচনার শীর্ষে এসে পড়ে। আব্বাস কিয়ারোস্তামি এই ছবির মাধ্যমে আত্মহত্যাকে উৎসাহ দিয়েছেন–এ রকম অভিযোগ ওঠে। আত্মহত্যা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ ও পাপ, আর রক্ষণশীল দেশ ইরান তাই পরিচালককে একজন দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে। তখন বেশ কিছু সময় দেশের বাইরে কিয়ারোস্তামিকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়।

সাম্প্রতিক ইরান রক্ষণশীল রাষ্ট্র হলেও পারস্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা অতিপ্রাচীন। চার হাজার বছর পুরনো কাব্য, ক্যালিগ্রাফি, মিনিয়েচার পেইন্টিং, পাথর ও সিরামিকের ওপর কাজ, কাপড়-গালিচা ও সংগীতের বিশাল ঐতিহ্য রয়েছে এই অঞ্চলের। গত শতাব্দীতে যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কয়েকবার তাদের যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হয়। আফগানিস্তান ও ইরাকের সাথেও তাদের যুদ্ধ হয়েছে। তাছাড়া নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলেছে দীর্ঘকাল। ১৯৭৯ সালে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান। আগে উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাণ করলেও ১৯৭৯-এর বিপ্লবের পর তাদের চলচ্চিত্র ধারায় অভাবনীয় উন্নতি সাধন হয়। বছরে অন্তত ৫০টি করে ভালো সিনেমা তৈরি হতে থাকে।

রিপাবলিক গঠনের আগে ইরানে মাত্র একটি টেলিভিশন প্রযোজনা সংস্থা ছিল সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়। নব্বই দশকের মাঝামাঝি ইরান সরকার কিছু কিছু সামাজিক সমস্যার কথা প্রকাশ করে। প্রথমবারের মতো সরকারি কর্তৃপক্ষ স্বীকার

করে যে পতিতাবৃত্তি, বেকারত্ব, শিশুশ্রম এবং গৃহহীন মানুষের উদ্বেগ তাদের সমাজে বিদ্যমান। এই অস্থিতিশীল অবস্থার সমাধান হলে রক্ষণশীলতার বাড়াবাড়ি দ্রুত কমে যাবে। তাত্ত্বিকভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা সহজ, কিন্তু বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন ঠিক তেমনই কঠিন। বলাই বাহুল্য সেই সময় ইরানের লক্ষ লক্ষ মানুষের চিকিৎসা, শিক্ষা এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের সুষ্ঠু অবকাঠামো ছিল না।

ইরানে মাজিদ মাজিদি, জাফর পানাহি, আজগর ফারহাদি, মহসিন মাকমালবাফ, সামিরা মাকমালবাফ থেকে শুরু করে অন্তত বিশজন বিশ্বমানের চলচ্চিত্র নির্মাতা ছবি বানিয়ে গেছেন। তাঁদের মধ্যে আব্বাস কিয়ারোস্তামির ছবির আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ও শৈলী সম্পূর্ণ আলাদা ও মৌলিক। কিয়ারোস্তামি *ক্লোজ-আপ* (১৯৯০), *অ্যান্ড লাইফ গোস অন* (১৯৯২), *থ্রু দ্য অলিভ ট্রিস* (১৯৯৪)-এর মতো অসাধারণ ছবি নির্মাণ করলেও *টেস্ট অব চেরি* (১৯৯৭) নানা দিক থেকে অতুলনীয়। ইরানি বাস্তবমুখী পরিচালকদের সিনেমার বিষয়বস্তু ছিল দারিদ্র্য, অসুস্থতা, বেকারত্ব, মানবিক টান ও শিশুদের জীবন। কিয়ারোস্তামিও তাই করেছেন, কিন্তু *টেস্ট অব চেরি* (১৯৯৭) এমন একটি ছবি যেখানে গভীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে কাজ করা হয়। সেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, নিষ্প্রাণ মানুষ বাদি গাড়ি চালিয়ে ঘুরছেন এবং জীবনের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করছেন। চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক কিয়ারোস্তামির কথাগুলো ব্যক্তি বাদি দর্শকদের নিকট পৌঁছে দেন। বর্ণনামূলক দর্শন ও চিন্তা প্রকাশের মাধ্যমটা হচ্ছে সেলুলয়েড ফিল্ম। সেই ফিল্মই *টেস্ট অব চেরি* (১৯৯৭)।

সিনেমাটি যুদ্ধোত্তর ইরানের বিষাদগ্রস্ত মানসিকতা ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্ব করে। বিপ্লব ও রক্তক্ষয়ের বিনিময়েও মানুষ স্বাধীনতা পায়নি। সমস্যাগুলো লুকিয়ে আছে তাদের মনের অভ্যন্তরে, ঠিক যেভাবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেও মাটির নিচে লুকানো অবস্থায় থেকে যায় বিধ্বংসী মাইন। দেশকে নতুন করে গড়তে ও সুষ্ঠু জাতি হিসাবে দাঁড় করানোর জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন পড়ে। সেই পরিশ্রম তারা করতে ব্যাকুল। চলচ্চিত্রটির সর্বপ্রথম সংলাপটি হচ্ছে– "Labourers" (*Kiarostami, 1997, 00:01:08*) দিনমজুর ও শ্রমিকেরা তাদের নিত্যদিনের কাজের সন্ধান করছে।

চিত্র-৮ : সিমেন্ট কারখানার গার্ডের সাথে কথোপকথন

ফিল্ম স্কলার হামির রেজা সাদার তাঁর *Iranian Cinema : A Political History* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

"Three main groups made up the unemployed population: laid-off and expelled workers, graduates, and already jobless casual labourers." (Sadr, 2006, p.166)

কিয়ারোস্তামি ইরানের দারিদ্র্য ও বেকারত্বের দিকটা তুলে ধরেন, তবে কাহিনির প্রয়োজনীয়তা না থাকায় পুরো ছবির যাত্রা জুড়ে কোনো ঐতিহ্যবাহী পারস্য সংস্কৃতি ও উৎসব প্রদর্শন করেন না। তিনি একটিমাত্র বাস্তবতার সাথে যুক্ত থেকে রচনা করেন বাস্তব জগতের কাব্যমালা।

চিত্র-৯ : কিয়ারোস্তামির শুটিংয়ের অংশ ব্যবহৃত হয় মূল ছবির শেষে

> "Perhaps the most enduring aspect of Kiarostami's cinema is preciously his discontent with 'reality' as it is." (Dabashi, 2007, p.295)

আব্বাস কিয়ারোস্তামি ইরানের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের একজন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, ফটোগ্রাফার, চিত্রকর ও গ্রাফিক ডিজাইনার। ষাটের দশকে টেলিভিশন বিজ্ঞাপন দিয়ে কর্মজীবন শুরু করলেও দ্রুত চলচ্চিত্র নির্মাণে চলে আসেন। প্রথম দিকে তৈরি করেছেন শিশুদের জন্য বেশ কয়েকটি শর্ট ফিল্ম। সেই সময় অনেক চলচ্চিত্র বিশ্লেষকরা কিয়ারোস্তামিকে সমালোচনা করেছেন তার ছবিতে নারী চরিত্রের অনুপস্থিতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রদর্শন না করার কারণে। তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্র– *কোকার ট্রিলজি* (১৯৮৭, ১৯৯২, ১৯৯৪), *ক্লোজ-আপ* (১৯৯০), *টেস্ট অব চেরি* (১৯৯৭) থেকে শুরু করে *দ্য উইন্ড উইল ক্যারি আস* (১৯৯৯) সবকটিতেই নারী চরিত্রের আধিক্য কম, সন্দেহ নেই। সেই আলোচনা-সমালোচনার বাঁধ ভাঙল *টেন* (২০০২) ছবির মাধ্যমে। ডিজিটাল ক্যামেরায় ধারণ করা *টেন* (২০০২) চলচ্চিত্রের শুরুতেই দেখা যায় একজন নারী গাড়ি চালিয়ে তার ছেলেকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে এবং পারিবারিক নানা জটিলতা নিয়ে কথা বলছে। দশটা আলাদা ঘটনা ও কথোপকথন গাড়ি থেকে ক্যামেরায় ধারণ করে নির্মিত ছবি *টেন* (২০০২)। এতে *টেস্ট অব চেরি* (১৯৯৭) সিনেমার পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে, চলন্ত গাড়ি থেকে সংলাপ ও দৃশ্য উপস্থাপন পদ্ধতিতে। এরপর শুধু নারী চরিত্রদের অভিব্যক্তিকে

কেন্দ্র করে তৈরি করেন সিনেমা *শিরিন* (২০০৮)। কিয়ারোস্তামির *ক্লোজ-আপ* (১৯৯০) চলচ্চিত্রে সরাসরি ইরানের রাজনৈতিক অবস্থার নেতিবাচক প্রভাব দেখানো হয়েছে। বাস্তবতা হলো কিয়ারোস্তামির মতো চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রকৃতপক্ষে একজন শিল্পী। সৃষ্টিশীল কাজে মতের ভিন্নতা, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সবটাই থাকতে পারে, যেখানে কোনো চিন্তাকে ধ্রুব বলে ধরে নেয়া যায় না। কিয়ারোস্তামি যে বিমূর্ত শৈলীতে সমাজে মানুষের অচলাবস্থা ও রাজনীতির অন্ধকার দিক দেখিয়েছেন, যা পর্যায়ক্রমে স্পষ্ট হয়। রাজনীতির বাইরে রাষ্ট্র তথা সমাজ চলে না। আর সমাজের মানুষের প্রতিফলনই তাঁর সিনেমার মূল প্রতিপাদ্য। *টেস্ট অব চেরি* (১৯৯৭)-তে যে মানসিক সংকট দেখানো হয়েছে তা যুদ্ধোত্তর দেশের অচলাবস্থার বহিঃপ্রকাশ। কিয়ারোস্তামির বক্তব্য প্রদর্শিত হয়েছে *টেস্ট অব চেরি* (১৯৯৭)-এর দৃশ্যপট ও সংকটে থাকা একজন ব্যক্তির সংলাপের মাধ্যমে।

চিত্র-১০ : চাঁদের আলোতে নিজের খোঁড়া কবরে শুয়ে আছেন বাদি

সিনেমার শেষে কলাকুশলীদের নাম আসার আগে আগে আবহসঙ্গীত আসে, অন্যথায় ছবিতে কোনো মিউজিকের ব্যবহার নেই। কিয়ারোস্তামি সেখানে লুইস আর্মস্ট্রং-এর 'সেন্ট জেমস ইনফার্মারি' মিউজিকটি ব্যবহার করেন। দৃশ্যত তখন দেখা যায় হাস্যোজ্জ্বল, উল্লসিত সৈনিকদের সবুজ মাঠে বিশ্রাম নিতে। সৈন্যদলের অকৃত্রিম চিত্র ক্ষণিকের জন্য দূরে সরিয়ে রাখে সকল হতাশা, ফিরিয়ে আনে জীবনের আকাঙ্ক্ষা। আবহসঙ্গীত নিয়ে কিয়ারোস্তামি বলেন,

"A piece of music, that in this sense is very close to the poetry of Omar Khayyam, where joy finally emerges from sorrow." (Elena, 2005, p.142)

পরিশেষে উল্লেখ্য, অসমাপ্ত ঘটনার জন্য *টেস্ট অব চেরির* (১৯৯৭) কাহিনি সীমা নির্দেশ করা কঠিন। চেরি ফলের মিষ্টি স্বাদ একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আত্মপ্রকাশ, যা মূল্যায়িত করে জীবনকে। শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য মানুষের বৈষয়িক সম্পদ জরুরি না। অর্থ, খ্যাতি ও সাফল্য প্রয়োজনীয় বিষয় অবশ্যই, কিন্তু আত্মপরিচয়ের মানদণ্ড না। নেতিবাচক মানসিকতা এড়িয়ে বাস্তবকে ভালোবাসতে পারলে মানবজীবন সুন্দর হয়। প্রকৃতির দেয়া ঐশ্বর্যে পৃথিবী পরিপূর্ণ, তা অনুভব করতে প্রয়োজন কেবল চেতনা ও সন্তুষ্টি। সকল প্রাণীর মতো মানুষেরও জীবনের শুরু ও শেষ আছে। বিষয়টা প্রাকৃতিক নিয়মেই সম্পন্ন হয়। সর্বোপরি *টেস্ট অব চেরি* (১৯৯৭) চলচ্চিত্রের অনুভূতিটি হচ্ছে– মৃত্যু অনেক জটিল চিন্তার ফল, অথচ বেঁচে থাকার জন্য অতিসামান্য কিছুই যথেষ্ট। হতে পারে তা সামান্য মিষ্টি ফলের স্বাদ।

তথ্যসূত্র :

১। Bordwell, D. and Thompson, K., (2010), *Film Art: An Introduction*. 9th ed., McGraw-Hill: New York

২। Dabashi, H., (2007), *Masters & Masterpieces of Iranian Cinema*, Mage Publishers: Washington DC

৩। Elena, A., (2005), *The Cinema of Abbas Kiarostami*, Saqi Books: London

৪। Holland N. N., (1998), *Abbas Kiarostami & Taste of Cherry* [online] Available at: http://www.asharperfocus.com/cherry.html [Accessed 11 September 2023]

৫। Kiarostami, A., (Director). (1997). *Taste of Cherry* [Cinema], Still Photos

৬। Sadr, H.R., (2006), *Iranian Cinema: A Political History*, I.B. Tauris & Co. Ltd: New York

৭। Saeed-Vafa, M. and Rosenbaum, J., (2003), *Abbas Kiarostami*, University of Illinois Press: USA

লেখক পরিচিতি: **কাজী সালমান শীশ**, লেখক, নির্মাতা এবং সিনিয়র লেকচারার, ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ, স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

Role of Media for Strengthening Local Government in Bangladesh : A Qualitative Study

Sayma Arju & Jamil Ahmed

Abstract :

Local government is responsible for the management of local affairs by locally elected officials. Local government influences economic development and planning which include : public welfare, maintenance of law and order, revenue collection, development and adjudication of government grants etc. It also provides people and businesses with essential services in defined areas like social care, schools, housing, waste collection, licensing of local vehicles, registrar services (births and deaths), and pest control. Like any other sector of government in the case of local governance, the media can play a vital role in publicizing changes to policies, recruiting government workers and volunteers, promoting events, and directly corresponding with citizens about important local issues. Media plays a crucial role in publicizing policies, recruiting government workers, and promoting events. The aim of this study is to explore the public perception about the role that Bangladeshi media plays towards Local Government institutions specifically to the *union parishad*. It also focus on the fact whether media significantly contribute to strengthening the LG. For this study data have been collected through interviews with LG representatives, journalists, media experts, LG experts and policy makers (N=30). The study suggests, for strengthening local government systems, ensuring people's participation, and providing adequate training on LG reporting are necessary. It is possible to inform both LG and the media about practical realities through joint training and capacity-building initiatives. This study may inspire influential stakeholders, such as journalists, researchers, policymakers, and MPs, to initiate policy dialogues and formulate better policies for local government.

Introduction :

Bangladesh has a long tradition of local government, with *Union Parishads* (UPs) being the first tier of the local government structure. At present there are 4562 UPs in Bangladesh. UPs are active in local level development activities, such as tax collection, dispute resolution, service delivery, water sanitation, birth and death registration, and public health. Unfortunately, their positive initiatives and images are rarely highlighted in the media. According to Siddiqui (1984), Bangladeshi print media often use sensationalism to overshadow mobilization and sometimes lead to blackmail. It is assumed that the media represents local government in a negative light due to a communication gap between them and stakeholders. Evidence shows that the *Amader Sthaniyo Sarkar* (Our Local Government) television program and *Amader Sarker* (Our Government) Radio Magazine Program have effectively promoted citizen rights to information and services, promoting responsiveness and accountability in local governance. Media advocacy through these programs has set a milestone, leading to changes in strengthening local government institutions in Bangladesh by creating a reliable stream of publicity for *Union Parishads* of different localities, encouraging viewers and policymakers to get involved in discussions, creating a positive public perception of UPs, and encouraging those who engage in irregularities to correct their ways. The purpose of this qualitative study is to examine how local government representatives, journalists, LG experts, and policymakers perceive the existing relationship between media and local government in Bangladesh, and how media helps strengthen local governance processes and structures. The research uses semi-structured interviews to explore the nuances of media engagement with local government institutions. The study takes into account the unique socio-cultural and political milieu of Bangladesh, where media freedom and government accountability coexist with challenges. The study aims to provide valuable insights that can inform academic discourse and guide policymakers and media practitioners towards fostering a more constructive and participatory relationship between media and local government in Bangladesh.

Local governments and the role of media :

Media serves as a bridge connecting local authorities and citizens, facilitating transparency, accountability, and citizen participation. It acts as an information disseminator, watchdog, agenda-setter, and platform for civic engagement within the realm of local governance (Kramp et al., 2016). Transparency and accountability, foundational elements of effective local governance, are fostered through media by disseminating information related to government activities, budgets, and decisions (Besley & Burgess, 2002). Media's watchdog function comes to the forefront as it investigates and exposes instances of corruption, mismanagement, and malfeasance, effectively holding local government officials accountable (Mansell, 2012). Furthermore, media can influence the local government's agenda by highlighting specific issues, thereby guiding policy priorities and decisions (McCombs & Shaw, 1972). Additionally, by providing citizens with information and platforms for discourse, media encourages active citizen participation in local governance (Coleman, 2012).

A fundamental aspect of the media's role in strengthening local government is its ability to enhance transparency and accountability. Transparency in local government is achieved when media acts as a conduit for the dissemination of information related to government activities, budgets, and decision-making processes (Besley & Burgess, 2002). Media outlets serve as information intermediaries between local authorities and the public, ensuring that citizens are well-informed about government actions, policies, and initiatives (Gandy, 1982). This dissemination of information empowers citizens by providing them with the knowledge needed to engage with local government processes effectively (Kramp et al., 2016). In this way, the media acts as a key driver in reducing information asymmetry between the government and its constituents, thereby fostering transparency (Olken, 2007).

In addition to transparency, accountability is a pivotal aspect of effective local governance, and media plays a critical role in its enforcement. The media acts as a watchdog, scrutinizing local government activities and exposing instances of corruption,

nepotism, and other forms of malfeasance (Mansell, 2012). Investigative journalism, in particular, plays a vital role in uncovering mismanagement, embezzlement of funds, and unethical practices within local government, leading to legal actions and improved financial oversight (Powers & Vera-Bedolla, 2012). The mere presence of a vigilant media serves as a deterrent against unethical behavior among government officials, as the fear of negative media coverage can influence their decision-making (Besley & Burgess, 2002). Thus, media acts as a crucial accountability mechanism that holds local governments to a higher standard of ethical conduct (Olken, 2007).

Media's role in setting the local government's agenda is another dimension of its impact on strengthening governance. Through editorial decisions, news coverage, and the framing of stories, media outlets can influence public discourse and shape the priorities of local governments (McCombs & Shaw, 1972). By highlighting specific issues or concerns, the media can steer public attention toward matters that require immediate attention or policy action (Borah, 2011). For instance, investigative reports on environmental hazards or infrastructure deficiencies can prompt local authorities to take corrective measures (Vivian, 2013). In this way, media serves as a bridge between the government and citizens, ensuring that the concerns of the public are addressed by local authorities, thus enhancing governance responsiveness (Coleman, 2012).

Moreover, media's role in fostering citizen participation in local governance is pivotal for ensuring that government policies and decisions align with the needs and aspirations of the community. Through its role as an information provider, media offers citizens access to crucial information about local government activities, policies, and initiatives (Kramp et al., 2016). This information access is essential for empowering citizens to engage actively in the governance process by participating in public meetings, voicing concerns, and providing feedback (Coleman, 2012). Media outlets also create public forums through editorials, opinion pieces, and talk shows where citizens can discuss local issues, share their perspectives, and interact with government officials, thereby

promoting civic engagement (Besley & Burgess, 2002). Media can also serve as a platform for mobilizing citizens around specific causes or initiatives, fostering community activism and collaboration (Powers & Vera-Bedolla, 2012). However, it is important to acknowledge that media's influence on public discourse and engagement is not without challenges, as issues of bias, sensationalism, and misinformation can hinder the quality of public discourse and engagement (Vivian, 2013).

The effectiveness of media in strengthening local government is closely intertwined with the state of the local media landscape. The ownership and control of local media outlets can significantly impact their editorial independence and their ability to scrutinize local government actions objectively (McChesney, 1999). Media ownership patterns can either enhance or undermine the media's role as a watchdog and promoter of accountability (Powers & Vera-Bedolla, 2012). Besides, financial constraints and political interference influence the vibrant and independent local media environment (Carpini & Keeter, 1996; Hallin & Mancini, 2004). In the 21st century, the synergy between media and local government remains vital for building resilient and responsive communities.

A Synthesis of Studies on Local Government in Bangladesh :

Local government in Bangladesh has been a subject of extensive research and study due to its significance in the country's governance structure and development. These studies collectively shed light on various aspects of local government, its challenges, and the role it plays in shaping the nation's socio-political landscape. This synthesis provides a concise overview of key findings and insights from these studies:

1. **Local Government Structure and Functionality**: Researchers such as Rahman (2012) and Ahmed (2017) have examined the structure and functionality of local government in Bangladesh. They highlight the importance of Union Parishads, Upazila Parishads, and City Corporations as key local governance bodies. These studies reveal that while these institutions have the potential to enhance local development and service delivery, their effectiveness is often hampered by issues such as resource constraints, bureaucratic red tape, and political interference.

2. **Relationship between Media and Local Governance** : in their studies of Zafarullah and Howlader (2008) and Islam (2016) argue that media acts as a vital bridge between local governments and citizens. Media outlets play a significant role in disseminating information, holding local officials accountable, and fostering citizen participation. However, challenges such as financial constraints and threats to journalists' safety (Kabir, 2017) can impede the media's effectiveness in promoting transparency and accountability.

3. **Corruption and Accountability** : Corruption within local government institutions has been a recurring concern in studies conducted by Hussain (2017) and Alam (2019). These studies uncover instances of corruption, embezzlement, and mismanagement within local governments. They underscore the importance of investigative journalism and media exposure in curbing corrupt practices and promoting accountability.

4. **Citizen Engagement and Participation** : Ahmed (2020) and Islam & Biswas (2014) delve into the concept of citizen engagement and participation in local governance. They argue that citizen participation is essential for local governments to be responsive and representative. Media, through various platforms and forums, plays a pivotal role in mobilizing citizens, fostering discussion, and encouraging active participation in local decision-making processes.

5. **Digitalization and Access to Information** : The role of digital media in enhancing local governance is explored by Rahman (2016). This study highlights the impact of digitalization on expanding the reach and accessibility of local news in Bangladesh. The availability of information through online platforms has empowered citizens to engage with government information more conveniently, contributing to greater transparency and awareness.

6. **Challenges and Threats to Local Governance** : Challenges such as political interference, bureaucratic hurdles, and financial constraints are recurrent themes in studies by Hasan (2018) and Chowdhury (2019). These challenges hinder the efficient functioning of local government institutions and can erode public trust. Political influence, in particular, poses a significant threat to the independence and effectiveness of local governments.

7. **Decentralization and Governance** : Research indicates that decentralization efforts in Bangladesh have aimed to bring government closer to the people, enhance local autonomy, and improve service delivery (Bashar et al., 2012; Choudhury et al., 2015). However, challenges persist in translating decentralization policies into effective local governance. Administrative capacity, political interference, and a lack of resources often hinder the ability of local governments to fulfill their mandates (Hossain, 2016).

8. **Service Delivery and Development** : Studies consistently emphasize the importance of local government in service delivery, particularly in rural areas where access to basic services remains a challenge (Begum & Choudhury, 2019; Hasan & Mahmood, 2017). Local governments are responsible for key sectors such as education, healthcare, and infrastructure. Ensuring the equitable distribution of resources and services across regions remains a priority.

In conclusion, studies on local government in Bangladesh reveal a complex landscape marked by opportunities and challenges. While local government structures hold the potential for promoting development and service delivery at the grassroots level, issues like corruption, political interference, and resource constraints continue to pose significant hurdles. Therefore, more studies are needed addressing these challenges and fostering a robust partnership between media and local government for building responsive and resilient communities in Bangladesh.

The objectives of the current research are : i) to reveal the stakeholders' perception of current practicing role of the local media towards the local government institutions and ii) to determine what changes in common practices of media can improve the perceptions of local government institutions specifically *the union parishads* among citizens, donors, and policy makers.

Methodology :

This study employed a quantitative approach to reveal the answer research questions like how do media collect and publicize news about LG ?; What is the level of satisfaction and dissatisfaction by local authorities with the coverage of their activities by media?; What could be done to improve the relationship between media and LG?, and to strengthen the local government institution e.g. *Union Parishads*, what steps could be taken by local media?

In this study, for collecting data total 30 samples were selected for interview. These samples were chosen by using purposive method keeping in mind some selective criterion like number of times elected as UP chairmen and members; journalists and media professionals who are experienced in reporting on local governance issues in different media for a substantive (at least five years) period of time. For keeping the reliability of the research, respondent were interviewed twice keeping at least six months gap between the interviews. The breakdown of the respondents' number is as follows:

Group of respond-ents	Type of respondent	Status of respondents	No. of respondents	Reasons for choosing the respondents
1	Local Government Representative	UP chairman	10	They are people's representative members of Union Parishads, chosen on the basis purposive sampling method.

2	Local Government Experts	University professors, LG researchers, NGO professionals	5	They were selected in order to understand the research problem more comprehensively. This group of respondents comprises the group of specialists, researchers and university professors. Thus, they were considered relevant sources of information on research problem
3	National Journalist	Senior reporters and journalists of national dailies, weeklies, TV and radio stations	10	They were selected in order to understand what practical realities they face when they go for any reporting on LG issues when they decide about topics of LG reports and when they assign local reporters for collecting LG information. This group of population is also selected on the basis of purposive method.
4	Local Journalist	Corresponde-nts of different newspapers and media, based at districts, UPZ and UP levels	5	They were selected in order to understand what practical realities local reports face during collecting reports from local levels, how local citizens react when journalists go to them for collecting LG data and also to know the relation between local journalists and local government representatives. This group of population is also selected on the basis of purposive method.

For this study, a Semi-structured interview questionnaire was prepared containing 10-12 questions focusing on Demographic, Knowledge, Opinion, Feeling questions In the interview question in particular, the following themes were referred :

i. the source that media use collecting and publicizing local government stories
ii. the level of satisfaction or dissatisfaction by local authorities with the coverage of their activities by the media
iii. the level of satisfaction or dissatisfaction by the news media with information provided by the local authorities

iv. How does the negative placement of LG in Media help in creating negative mindset of the policy makers?
v. Ways of improving the local government and media relationship suggested by the respondents

Information from interviews were collected on audiotapes that were edited, summarized and coded to come up with clear understandable statements and conclusions. Descriptive data and evidence relating to each research question were classified into distinctive classes based on their common qualitative characteristics. Later the results were discussed in a narrative manner.

Data Analyses :

In order to get a clearer view about the research objectives the researcher interviewed the local government experts and policy makers, chief journalists, spokesperson from the LG representatives for getting their opinions on some specific questions. These responses helped the researcher to understand how media collect LG related news and how LG related news contribute in the policy reform process.

Responses from LG representatives :

In this study, during the interviews LG representatives shared practical realities they face in UP areas in terms of communicating with journalists, mobilizing media for publishing any news etc.

During the interview the LG representatives were asked the following questions :

a. Do you know how media collect news about local government?
b. Do you think media properly publicize local government news?
c. When any new policy/agenda arrives, do the media help you to know details about it?
d. Do you have any success story that was publicized by media?

e. What is the level of your satisfaction / dissatisfaction with the coverage of their activities by media?
f. Do you have any recommendations about media?

In their response some participants (N=3) comments that the Local journalists are not communicative and generally the Journalists do not interact with the LG representatives. In response to the question whether media properly publicize local government news, the LG representatives (N= 8) said journalists are not interested about positive news on LG rather they are interested about political news especially news about elections and disbursing reliefs. In this regard few representatives made some interesting comments. Like a UP chairman (S=7) said, “Journalists are fond of making a sensation by publishing negative news on UP and UP chairmen”. S=3 mentioned that, “Money talk at the local level – if we don’t spend money no news will be published. It is a win-win game, if we make journalists happy, they will make us happy” and S=9 said, “LG – Media behaves in such a way that it seems they are stepbrothers.” Some of the respondents also mentioned that “Journalists like to highlight local administration and politicians rather than LG representatives as they get incentives from them so there is a ‘give and take’ business here”.

Next respondent (S= 8) commented by being a bit emotional. "Yes, LG is negatively represented in the media. For this reason LG is not trusted by the general public. Media covers mostly negative news and there are LG representatives who are engaged in corruption. However, there are cases where putting political colour and twisted representation of LG representatives which are intentional. Say, they make news about the theft of wheat by UP chairs, but for each UP chair only a small amount (20 tons) of wheat is allocated which costs only 20,000 taka ... this is not a big news ... they overwhelm the news. Besides, LG representatives do not have much power. A small amount of authority is given to the UP chairs. Most of the time, they remain busy with less challenging activities like birth registration, cleaning, sanitation, etc. Let me share my example, in my case, though I was the first UP chair to arrange ambulances for the people

in my locality, the media did not cover what I did. It was not that journalists did not know about it. There were journalists who took advantage of the ambulance, and yet they did not cover the news. Other UP chairs might have taken the similar kinds of initiatives if the media had publicized this.”

A number of recommendations came out from LG representatives in order to resolve the communication gap between LG representatives and journalists. In this regard S=2 suggested organizing LG – Media dialogue for building a better relationship. LG representatives do not access any database containing information about journalists and media professionals, according to S=9. But with a complaining tone S=10 mentioned, “Many newspapers and media don’t have LG related assigned journalists, reporters”. Nevertheless, LG representatives demanded combined training for journalists and LG representatives. In this regard S=4 said, “Journalists don’t have adequate training on LG reporting. Adequate training should be provided for journalists." And S=7 said, “MoLGRD&C, NILG should arrange joint (LG and Media) training and capacity-building initiatives so that both sectors can be informed about the realities”.

Opinions from LG experts, LG advocates and policy makers :

The researcher interviewed LG experts, advocates, and policymakers to understand media's role towards local government institutions of Bangladesh and suggest ways to enhance their effectiveness. LG experts, LG advocate policy makers were asked the following questions :

a) What is your opinion about media's role in LG/UP?
b) Do you think media frames LG/UP properly?
c) As a policy maker, how do media influence you? Do you collect information from media and be biased as media reports or you use other sources to justify the information?
d) In your opinion what role media should play in LG policy reform?
e) Do you think, can media play agenda setting role? how?
f) What could be the ways of improving the local government and media relationship?

In their responses, most of the interviewed experts, advocates and policy makers (N=5) responded that media actually can play a significant role in collecting and disseminating LG related news and information. In response to a question whether media frames LG issues properly or not, few respondents (N=4) mentioned that media frames LG negatively and more interested in disclosing publicly about LG representative's personal lives rather than LG activities, good initiatives, positive news. Some of the respondents (N=4) told "UP is seen as a weak tier of LG, so media prefers to frame LG negatively and publicize negative news for getting readers' attention". For this type of negative framing of LG news, they also think there are some influences from local MPs and administration, which media counts significantly during framing any news related to LG. Another respondent said (S=12), "There is no negative news ... what has got the news value that comes into the news. But news published in the Media helps in policy making. But the main thing is, there are restrictions and obstacles in the system that do not let the LG to perform properly." Some of the respondents (N=3) commented that "It is a nexus – MPs, Local administration, all want weak LG so that it can be governed easily". Some other respondents (N=3) commented that – "LG and UPs are dominated by MPs in such a way that they can't function properly" and "LG is not local and it is not a government as they don't have enough budget and autonomy".

When the LG experts and policymakers were asked questions like 'how do media influence them? and do they collect information from media and be biased as media reports or do they use other sources to justify the information?' All respondents (N=5) told that LG experts, MPs, Donors and Policymakers are influenced by media reports and this reflect in planning, designing, and implementing any LG-related projects, programs and LG related policy works. In response to a question whether media can play agenda setting role, a number of respondents (N=5) mentioned positively that media can play agenda setting role by disseminating different success stories, case studies and also by sharing recommendations and way forwards on LG.

In response to the last question "What could be the ways of improving the local government and media relationship?" the respondents offered a number of recommendations. One respondent (S=14) commented, "LG representatives must stop activities that generate controversy. They must show the required accountability and transparency in their activities. They must identify the loopholes in their activities and try to minimize them. Besides they must try how to benefit the mass population... they have to practice more positive activities. They have to take proactive initiatives. Journalists must also ensure a positive image of LG by covering constructive news without bias. To make sure that the news they publish is beneficial to the country's population, they have to know how to prioritize it. They need to improve their skills."

By highlighting the needs of training for the journalists another respondent (S=15) commented, " in our country specialized reporting has not developed yet. For quality reporting both an academic background and training are needed. There is an overwhelming tendency for journalists to focus on corruption, personal details of the UP chairs, but they do not know how to make a news report on LG. Journalists need extensive training for this. In fact, there should be a change in the typical topics of discussion about LG. Again, there are projects that do not allow journalists to create news independently."

Some other insightful recommendations were also come out from the LG experts and policymakers on how to increase LG related news coverage in media, how to increase positive news on LG, how to communicate LG related news and information to LG experts, policymakers and how to influence them through policy related news of LG. (N=4) recommended that different newspapers and media houses can assign LG related reporters and journalists to cover interviews of LG experts and policymakers. For strengthening the relationship between LG and other stakeholders (N=5) suggested to organize LG – Media dialogue for obtaining advice and reform ideas from LG experts, policymakers. Besides (N=4) suggested that LG experts and policy makers can be invited to visit successful LG projects, model UPs and activities so that they can share their

opinion in the policy formulation process. For bridging the gap, (N=2) suggested that LG representatives (UP chairmen) should interact with LG experts and policymakers and keep them updated about their good initiatives, so they can communicate that information in important forums. (N=2) emphasized the necessity of a database of policymakers, donors, MPs, and specialists in LG. Almost all respondents (N=5) recommended significantly that MoLGRD&C and NILG should arrange training programs for media and LG representatives where LG experts and policymakers can be invited as resource speakers, through this initiative capacity building will be done properly.

Opinions from Chief Journalists and Media Analysts :

Chief journalists were asked the following questions :

a) How do media collect LG/UP related news and prepare report on that?
b) Do you think these kinds of reports could influence policymakers and donors? Why or why not?
c) Do you think media needs training and capacity building support for performing their roles?

In response to the question, 'How do media collect LG/UP related news and prepare report on that?', the respondents (N=7) said that recently every news and media production house gave importance to the news collected from remote areas than the news from the capital city. However, until now, no special incentives have not been offered to local journalists for collecting news about local government. In this regard one respondent (S=20) said, "Not only LG but in all sectors, news that can create public sensation is published. Human taste has changed a lot. Any news about corruption, irregularity, abnormal behaviour or happenings etc. gets viral now a days. People want to watch and listen to these and that's why we prioritize these kinds of news."

In response to the question "Do you think these kinds of reports could influence policymakers and donors?" The respondents shared some interesting and insightful information. For example, one respondent (S=26) shared, "the donors mainly collect news using

two sources: i) from media specially from newspapers and ii) from local NGO who share news about the LG as a summary. Having screened this information, the donor group makes a decision. Thus, donors' groups are more or less influenced by LG compliance, good governance practices, and malpractice."

However, by bringing an analogy a respondent (S=28) said, "in the present structure of Bangladesh, the LG has a limited scope for work. But it is not impossible to reform the LG structure and remove corruption. For this purpose, effective planning is essential. For instance, a framework can be developed to distribute relief to the poor and marginalized. This framework should include high officials, local officers, journalists, and the UP chairs. In this framework journalists will play the role of a watchdog to minimize the chances of corruption at any stage of the procedure."

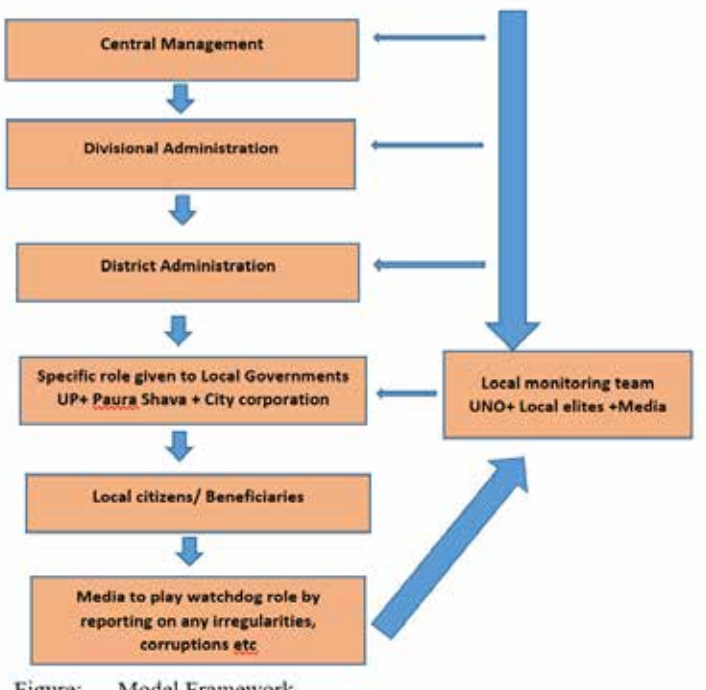

Figure: Model Framework

Findings :

The following findings derived from the data presented in the analyses part. Through the findings of the study, answers to the research questions are addressed.

a) There is a communication gap among the journalists and the LG representatives. Media covers just about some specific news about the Local Government institutions and therefore, the real picture of *Union Parishads* remain hidden from the public eye.

b) LG's negative media coverage and intentional twisted representation foster public distrust and prevent local *Union Parishad* representatives from establishing credibility with the populace. Because of this, even worthwhile endeavors often fall flat with the public.

c) LG representatives recommended a dialogue between LG and journalists to address communication gaps. They emphasized the need for a database of information about journalists and media professionals, and demanded combined training for journalists and LG representatives. They also suggested joint training and capacity-building initiatives for both sectors. Similar suggestions have come from LG experts and policy makers. They emphasized the need for a database of LG policymakers, donors, MPs, and specialists. They recommended MoLGRD&C and NILG to organize training programs for the media and LG representatives.

d) Most experts, advocates, and policy makers believe media plays a crucial role in collecting and disseminating LG-related news and information. However, some respondents argue that media often frames LG negatively, focusing on personal lives of LG representatives rather than LG activities or initiatives. This negative framing is occasionally influenced by local MPs and administration. While media helps in policy making, there are restrictions and obstacles in

the system that hinder LG's performance. Some respondents believe that the system is dominated by MPs, limiting LG's budget and autonomy.

e) Media reports influence LG experts, MPs, donors, and policymakers in planning, designing, and implementing projects and programs. Respondents positively suggest media can play an agenda setting role by disseminating success stories, case studies, and recommendations.

f) Both the LG representatives and the local journalists can contribute to the improvement of their relationship by taking a few initiatives. LG representatives are expected to reduce controversial activities, demonstrate accountability and transparency, identify loopholes, and benefit the mass population. Furthermore, journalists are encouraged to engage in positive activities, take proactive initiatives, and cover constructive news without bias. Prioritizing and improving skills is also suggested.

g) Journalists in the country need extensive training for quality reporting, as specialized reporting has not yet developed.

h) To strengthen the LG , increasing media coverage of LG-related news specially promoting positive news, covering interviews of the stakeholders of the LG, organizing media dialogues, inviting experts to visit successful projects, and keeping LG representatives updated about each other's initiatives and success stories are highly recommended by LG experts and policy makers.

i) No special incentives are offered to the journalist for collecting local government news. Therefore, a common tendency has grown up among local journalist to collect and publicize viral news about corruption, irregularities, and abnormal behavior.

Recommendations:

The following recommendations are derived from the present study :

1) LG journalists & media professionals forum needs to be formed so that regular LG – Media dialogue could be organized for relationship building
2) Directory and database of LG representatives and contact information of media houses, LG journalists and media professionals needs to be developed
3) Adequate training on LG reporting should be provided to journalists and media representatives. MoLGRD&C, NILG can arrange joint (LG - Media) training and capacity-building initiatives so that both sectors be informed about the practical realities
4) Newspapers and media houses should assign LG related reporters and journalists to cover LG news. LG related success stories should be publicized in print and electronic media so that LG representatives are motivated to perform their duties
5) Journalists and media professionals should be invited to visit successful UPs for better understanding on LG functions, challenges and opportunities. LG representatives (UP chairmen) should interact with journalists on a regular basis and keep them updated about their good initiatives and challenges they face.
6) Authority should be given to LG representative to perform more activities so that they may increase their capacity to serve the people. Representatives of LG must cease practicing corruption, malpractices, and other allegations frequently raised against them. In their activities, they must demonstrate accountability and transparency. They must identify loopholes in their activities and try to minimize them. Moreover, they should strive to benefit the mass population and achieve trustworthiness.
7) Journalists must also ensure a positive image of LG by covering constructive news without bias. To make sure that the news they publish is beneficial to the country's population, they have to know how to prioritize it. They need to improve their skills.
8) Specialized news reporting needs to be developed. For quality reporting both an academic background and training are needed. That is why students with relevant academic background must be encouraged to work in this sector. Journalists tend to focus on corruption and personal details about UP chairs. Most of the local journalists do not know how to make a news report on LG. Journalists need extensive training on how to report and what to report on. Journalists must not focus on their popularity but on the real development of the country.
9) In order to strengthen local government, effective planning is essential. The inclusion of high officials, local officers, journalists, and UP chairs in the plan may create a positive vibe about LG among citizens, donors, and policymakers. Nevertheless, journalists must act as watchdogs in the planning to minimize corruption.

Conclusion :

Media is seen as a vital tool to ensure local government accountability and efficacy by bridging the information gap between officials and representatives of regional areas. In Bangladesh, a strong and positive relationship between media and local government is essential for making local government more accountable, transparent, and enhancing public participation in local government issues. Through this study various stakeholders, including UP representatives, LG experts, journalists, and media professionals, have suggested various strategies for improving existing relationships between local government and media. These include joint exposure visits, creating databases of LG representatives, organizing training and capacity-building initiatives, publicizing success stories, assigning reporters, providing adequate training on LG reporting, organizing dialogues, inviting journalists to visit successful UPs, investing in journalists, and updating journalists regularly about good news and challenges faced by LG

representatives. This study may play a significant role in bringing forth fresh ideas and insights about how a positive impression on local government in the media can inspire influential stakeholders, encouraging policy dialogues and formulating better policies for Bangladesh's local government.

References :

Ahmed, S. U. (2017). Role of media in promoting local governance in Bangladesh : An analysis. Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humanities), 62(1), 91-107.

Alam, M. S. (2019). Investigating Corruption and Mismanagement in Local Governments : Lessons from Bangladesh. *International Journal of Public Administration, 42*(8), 655-668.

Ahmed, S. (2020). Citizen Engagement and Participation in Local Governance : A Case Study of Bangladesh. *Journal of Public Participation & Collaboration, 14*(1), 52-67.

Bashar, A., et al. (2012). Decentralization and Local Governance in Bangladesh : An Analysis of Policy and Implementation. *Asian Journal of Political Science, 20*(2), 190-208.

Begum, S., & Choudhury, M. A. (2019). Local Government, Service Delivery, and Rural Development in Bangladesh. *Asian Journal of Political Science, 27*(1), 82-98.

Besley, T., & Burgess, R. (2002). The Political Economy of Government Responsiveness : Theory and Evidence from India. *The Quarterly Journal of Economics, 117*(4), 1415-1451.

Borah, P. (2011). Conceptualization and Measurement of Issue Importance for Agenda-Setting : An Examination of the Relationship between Attributes of Issues and Measures of Issue Importance. *Mass Communication and Society, 14*(5), 615-634.

Carpini, M. X. D., & Keeter, S. (1996). What Americans Know About Politics and Why It Matters. Yale University Press.

Coleman, S. (2012). Civic Engagement in American Democracy: A Literature Review. *American Politics Research, 40*(1), 181-211.

Chowdhury, S. U. (2019). Media and local governance in Bangladesh : The role of local newspapers. Media Asia, 46(2), 103-113.

Choudhury, M. A., et al. (2015). Decentralization and Local Autonomy in Bangladesh : Issues and Challenges. *Journal of Asian and African Studies, 50*(3), 351-366.

Coleman, S. (2012). Civic Engagement in American Democracy: A Literature Review. *American Politics Research, 40*(1), 181-211.

Gandy, O. H. (1982). Beyond Agenda Setting: Information Subsidies and Public Policy. *Columbia Journalism Review, 21*(4), 2-6.

Hasan, M. (2018). Challenges and Threats to Local Governance in Bangladesh : An Assessment. *Journal of Public Administration and Governance, 8*(4), 34-48.

Hasan, M., & Mahmood, M. (2017). Local Government and Service Delivery in Rural Bangladesh: Challenges and Opportunities. *International Journal of Public Administration, 40*(8), 734-747.

Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). Comparing Media Systems : Three Models of Media and Politics. Cambridge University Press.

Hossain, M. (2016). Administrative Capacity and Decentralization in Bangladesh : A Study of Local Government Institutions. *Public Administration and Development, 36*(4), 256-269.

Hussain, A. (2017). Corruption in Local Government Institutions : A Case Study of Bangladesh. *Journal of Public Administration and Governance, 7*(1), 71-85.

Islam, M. S., & Biswas, A. (2014). Promoting Citizen Engagement in Local Governance : Lessons from Bangladesh. *Local Government Studies, 40*(5), 713-732.

Islam, M. S. (2016). The Nexus between Media and Local Governance : A Case Study of Bangladesh. *Media Asia, 43*(2), 100-112.

Kabir, A. (2017). Challenges Faced by Journalists in Reporting on Local Governance in Bangladesh : A Study of Threats to Media Freedom. *Asian Journal of Journalism and Mass Communication, 1*(1), 1-15.

Kramp, L., Howard, P. N., & Hussain, M. M. (2016). The Role of Digital Media in the Arab Spring. *International Journal of Communication, 10*, 2.

Mansell, R. (2012). Imaginary Internets: Overcoming Barriers to Building Sustainable Information Societies. *Telematics and Informatics, 29*(1), 24-34.

McChesney, R. W. (1999). Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times. University of Illinois Press.

McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. *Public Opinion Quarterly, 36*(2), 176-187.

Olken, B. A. (2007). Monitoring Corruption : Evidence from a Field Experiment in Indonesia. *Journal of Political Economy, 115*(2), 200-249.

Powers, M., & Vera-Bedolla, J. A. (2012). Transparency, Democracy, and Economic Justice in Latin America : Assessing the Impact of New Technologies on Governance. *International Journal of Communication, 6*, 2153-2172.

Rahman, A. (2016). The Role of Digital Media in Enhancing Local Governance : A Case Study of Bangladesh. *International Journal of Digital Communication and Network, 2*(3), 129-142.

Rahman, M. (2012). Local Government Structure and Functionality in Bangladesh : Challenges and Opportunities. *Journal of Public Administration and Governance, 2*(1), 1-16.

Siddiqui, M. A. (1984). Sensationalism and Its Impact on Local Government Representation in Bangladeshi Print Media. *Journal of Media Studies, 5*(2), 45-57.

Vivian, J. M. (2013). The Media of Mass Communication. *Pearson Education, Inc.*

Zafarullah, H., & Howlader, A. A. (2008). Media's Role in Bridging Local Governments and Citizens in Bangladesh. *Asian Journal of Communication, 18*(2), 173-189.

Author's Introduction: **Sayma Arju,** Associate Professor, Dept. of English, Stamford University & **Jamil Ahmed,** Research felow and founder executive Director of the Journalism Training & Research institute of USAID-BRAC University.

বাংলায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে কাঙাল হরিনাথের অবদান: একটি প্রাথমিক পর্যালোচনা

ওবায়দুল্লাহ্

ভূমিকা:

ছাপাখানা আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। ছাপাখানা আবিষ্কারের ফলে শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি উৎকর্ষ লাভ করে এবং সংবাদপত্রশিল্পের জন্য নতুন দ্বার উন্মোচন করে। উনিশ শতকের শুরুতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে ভারতবর্ষের কলকাতায় প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করা হয়। এ ছাপাখানার মালিকানা ও পরিচালনার ভার ছিল ইউরোপীয়দের হাতে। কলকাতায় ছাপাখানা স্থাপনের প্রায় ছয় দশক পর বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীতে (তৎকালীন নদীয়া জেলার কুমারখালী গ্রামে) একটি বৃহৎ আকৃতির (প্রায় ১.৫ টন ওজনের) ছাপাখানা স্থাপন করা হয়। এ ছাপাখানাটি স্থাপন করেন কুমারখালী নিবাসী সিদ্ধ সাধক, 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' এর সম্পাদক কাঙাল হরিনাথ মজুমদার। এ ছাপাখানা থেকেই মূলত 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকাটি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরোধী ছিল। এ পত্রিকায় গ্রামীণ সংবাদ ছাপা হতো। এ জন্য 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পত্রিকার সম্পাদককে গ্রামীণ সাংবাদিকতার পথিকৃৎ বলা হয়।

হরিনাথ ব্যক্তিগত জীবনে খুব একটা প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পাননি। তা সত্ত্বেও তিনি বালক বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। স্বশিক্ষিত কাঙাল হরিনাথ শুধু নিজের ইচ্ছাশক্তির ওপর ভর করে স্বজাতীয় যুবক ও নারীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য আমৃত্যু প্রাণান্তকর চেষ্টা করে গেছেন। তিনি ভারতবাসীর পরাধীনতায় অত্যন্ত ব্যথিত হন। 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পত্রিকার মে, ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ সংখ্যায় এ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন, 'পরাধীনতার কত দুঃখ, কত যাতনা, তাহা পরাধীনেই বিশেষ অবগত আছে। হতভাগ্য বঙ্গসন্তান চিরকাল পরাধীন। চিরকাল পরের লাথি খাইতে খাইতে তাহাদের জীবন অতিবাহিত হইল'। মহাত্মা কাঙাল হরিনাথের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানা ও 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'কে কেন্দ্র সমকালে রায় বাহাদুর জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৯), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

(১৮৬১-১৯৩০), দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩), মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১), শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (১৮৬০-১৯১৩) প্রভৃতি লেখকের জন্ম হয়েছে। মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনী গ্রন্থ 'আমার জীবনী'তে কাঙাল হরিনাথ সম্পর্কে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায়। মীর মশাররফ 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পত্রিকায় 'মশা' ছদ্মনামে লিখতেন এবং বিভিন্ন সময় সংবাদ প্রেরণ করতেন। তিনি বলেন, 'বস্তুতঃ কাঙাল হরিনাথ যিনি ছিলেন মীর সাহেব থেকে ১৪/১৫ বৎসরের জ্যেষ্ঠ। একাধারে ছিলেন সুহৃদ, সুহিতৈষী ও সদুপদেষ্টা'। কাঙালের ফিকিরচাঁদ ফকিরের গীতাবলী দলের সঙ্গেও মীর মশাররফ ও লালন শাহ ফকিরের (১৭৭২-১৮৯০) যোগাযোগ ছিল। সে জন্য তিনি কাঙাল হরিনাথের অনুপ্রেরণায় সংগীত লহরী রচনা করেন। কাঙাল হরিনাথ প্রথাগত সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিদ্যমান অসংগতি দূরীকরণের জন্য ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে। তিনি স্থানীয় জমিদার, নীলকর ও স্থানীয় প্রশাসনের অনৈতিক কর্মকাণ্ড ইংরেজ সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ছাপাখানা স্থাপন ও এর মাধ্যমে পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। আলোচ্য প্রবন্ধে কাঙাল হরিনাথের পরিচিতি, ব্রিটিশ বাংলায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও প্রাথমিক প্রচেষ্টা, ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে কাঙাল হরিনাথের অবদান, দর্শন, সংস্কৃতির রূপান্তর ও ঐতিহ্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

সময় বিবেচনায় ও বাংলার আর্থসামাজিক বাস্তবতায় ছাপাখানা স্থাপন ও বিকাশে কাঙাল হরিনাথের ভূমিকা নির্ণয়ের চেষ্টা করা আলোচ্য গবেষণার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বাংলার শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে ছাপাখানা কী ধরনের ভূমিকা রেখেছে এবং কাঙাল হরিনাথ কেন ছাপাখানা স্থাপন করেছিল তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার ফলে সাধারণ মানুষের ওপর কোনো ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং ছাপাখানার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের কী রূপ সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হয় তা জানার চেষ্টা করা হয়।

গবেষণা পদ্ধতি :

এ গবেষণায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসের মধ্যে কাঙাল হরিনাথের বসতভিটা পরিদর্শন করা হয়েছে। তিনি যে মুদ্রণযন্ত্রের মাধ্যমে কাজ করতেন সে মুদ্রণযন্ত্রটি কাঙাল হরিনাথের বসতভিটা থেকে সংগ্রহ

করে জাদুঘরে স্থাপন ও প্রদর্শনী কাজের সরাসরি দেখভাল করা হয়েছে। সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘরে রক্ষিত অন্যান্য নিদর্শন গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য পূর্ববর্তী গবেষণা প্রবন্ধ, স্মরণিকা, বই, পুস্তিকা, পত্রিকা, সাময়িকী, দলিল-দস্তাবেজ, স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরি প্রভৃতির সহায়তা নেয়া হয়েছে।

১. কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের পরিচিতি ও দর্শন

কাঙাল হরিনাথ সর্বজন স্বীকৃত একাধারে সাহসী সাংবাদিক, সাহিত্যিক, নারী শিক্ষার অগ্রদূত, গ্রামীণ সাংবাদিকতার জনক, বাউল সংগীত রচয়িতা, সাধক ও সমাজ সংস্কারক। তিনি নানা গুণে সমৃদ্ধ একজন মহীয়সী যুগ পুরুষ। তিনি ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জুলাই (১২৪০ বঙ্গাব্দের ৫ শ্রাবণ) কুমারখালীর কুন্ডুপাড়া গ্রামে এক দরিদ্র তিলি[১] পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন[২]। তাঁর বাবার নাম হলধর মজুমদার ও মায়ের নাম কমলিনী দেবী। কাঙাল হরিনাথের জন্মের এক বছর পরেই অর্থাৎ ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে কমলিনী দেবীর জীবনাবসান ঘটে এবং হলধর মজুমদার ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে পরলোকগমন করে (ব্রজেন্দ্রনাথ, ১৩৫৪ ব.: ৫)। অর্থাৎ কাঙাল হরিনাথান জন্মের মাত্র ৭ বছরের মধ্যেই মা ও বাবাহারা হয়ে যান। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর অনাথ হরিনাথ খুল্লপিতামহী আর্য্যা অবীরা এর আশ্রয় লাভ করেন। খুল-পিতামহী আর্য্যা অবীরা অনাথ হরিনাথকে নিজের সন্তানের সমতুল্য স্নেহ করেন। হরিনাথ তাঁকে 'দুধ মা' বলে সম্বোধন করে। ঘুড়ি ওড়ানো ছিল তাঁর অন্যতম সখ। এই শখ পূরণের জন্য তাঁকে অনেক সময় অবাধ্য হয়ে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থেকে দুরন্তপনায় মেতে উঠতে দেখা যায়। তিনি জেদি ও চঞ্চল প্রকৃতির ছিলেন। অভাব অনটনের বিষয়ে কাঙাল হরিনাথের ভাষায়,'বাল্যে খেলার সময় অন্য বালকেরা ক্রীড়োপযোগী বস্তু পিতামাতার নিকটে সহজে পাইয়া আনন্দ করিয়াছে, আমি তন্নিমিত্ত ক্রন্দন করিয়া মাটী ভিজাইয়াছি'। তথাপিও খুল্লপিতামহী আর্য্যা অবীরা হরিনাথকে খুব ভালোবাসত এবং নিজে না খেয়ে হরিনাথের খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন (আহসান, ১৪০৪ ব.: ৩০-৩১)। পিতার মৃত্যুর পর খুল্লপিতামহী আর্য্যা অবীরার আশ্রয়ে থেকে হরিনাথ ১৮৪১ খ্রিষ্টাব্দে

[১] সমকালীন যারা বংশপরম্পরায় তেল প্রস্তুত ও বিক্রয়ের পেশাগত কাজে নিযুক্তি ছিল সামাজিকভাবে তাঁদেরকে তিলি পরিবার বলা হতো।

[২] সা.কা.হ.স্মৃ.জাদু. এর স্মারক নম্বর: ৪৩.২২.৫০৭১.০৩০.৩৮.০১৯.২১.

পড়াশোনার জন্য কিছুদিন বিদ্যালয়ে যান। তিনি বিদ্যালয়ে অক্ষর পরিচয়, ধারাপাত, সুদ কষা প্রভৃতি আয়ত্ত করতে সচেষ্ট হন। তৎকালে লেখাপড়ার বেশি প্রচলন ছিল না। খাদ্য ও বস্ত্রের অভাব পূরণের জন্য সকলেই প্রাণান্ত প্রচেষ্টা করত। হরিনাথ খাদ্য ও বস্ত্র জোগানের অভাবে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন।

হরিনাথের বিবরণ থেকে জানা যায়, দূরসম্পর্কের আত্মীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মজুমদারে সহায়তায় কুমারখালীতে একটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই স্কুলে খুল্লতাত নীলকমল মজুমদার হরিনাথকে ভর্তি করেন। খুল্লতাত নীলকমল মজুমদার তাঁর লেখাপড়ার ব্যয় বহন করেন। কিন্তু কিছুদিন পর নীলকমল মজুমদার নিজেই আর্থিক সংকটে পড়েন। হরিনাথের জীবনে এর গভীর প্রভাব পড়ে এবং আর্থিক অভাব-অনটনের কারণে পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মজুমদার। তিনি হরিনাথকে বিনা বেতনে পড়ালেখার ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু অন্ন, বস্ত্র ও অর্থের অভাবে হরিনাথের প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। সে অর্থে বলা যায় কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া প্রথাগত শিক্ষালাভের আর সুযোগ হয়ে ওঠেনি।

এ প্রসঙ্গে হরিনাথ বলেন, 'এই সময়ে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয় একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। অধ্যয়নের নিমিত্ত তাহাতে প্রবেশ করিলাম। প্রতিপালিকা খুল্লপিতামহী আর্য্যা অবীরা, সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তিহীনা। অগত্যা মধ্যম-জ্যেঠামহাশয় দুটী অন্ন দিতে লাগিলেন। আমি কি করিব, জামিরদিয়ার কুঠিতে খুল্লতাত মহাশয়কে লিখিলাম। তিনি বেতন দিতে স্বীকার করিয়া স্কুলে পড়িতে বলিলেন। স্কুলে প্রবেশ করিয়া রীতিমত অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। ভিক্ষাদেবী পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিতে লাগিলেন। কোন কোন পাঠ্যপুস্তকের অভাব নকল করিয়া পূরণ করিতাম। আবার সহপাঠীদের অবসর সময়ে কোন কোন পুস্তক লইয়াও পাঠ অভ্যাস করিতাম। এ দিকে কুঠি বন্ধ হওয়ায় কুড়ামহাশয়ের চাকুরী গেল। তিনি আর বেতন দিতে স্বীকার করিলেন না। অর্থাভাবে লেখাপড়াও বন্ধ হইল" (সেন, ১৩২০ ব.: ৪)।

হরিনাথের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে গেলে নিজের অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের জন্য কুমারখালী বাজারের একটি কাপড়ের দোকানে দৈনিক দু'পয়সা বেতনে চাকুরী শুরু করে। কিন্তু তিনি দৃঢ় নৈতিকতার বলে ক্রেতাকে না ঠকাতে চাইলে দোকানদার তাঁকে

কর্মচ্যুত করে। ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে হরিনাথ পড়ালেখার জন্য নৌপথে মাথাভাঙ্গা নদী হয়ে কলকাতায় যায়। তৎকালে নৌপথে কুমারখালী হতে কলকাতায় যেতে ১০/১২ দিন সময়ের প্রয়োজন হতো। সমকালীন যোগাযোগ ব্যবস্থায় কুমারখালী থেকে কলকাতা পর্যন্ত রেলপথ চালু হয়নি। তিনি কলকাতায় গিয়ে পড়ালেখা বা কাজ-কর্মের কোনোরূপ বন্দোবস্ত করতে পারেন নি। ফলশ্রুতিতে তিনি নিজ গ্রামে ফিরে আসতে বাধ্য হন (সেন, ১৮৯৬: ৩০৪)। কলকাতা থেকে ফিরে এসে কাঙাল হরিনাথ খুব অস্থিরতার মধ্য দিয়ে দিন যাপন করেন। তিনি স্বদেশ ও স্বজাতীর করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বিচলিত হয়ে পড়েন।

নীলকর মহাজন কর্তৃক অসহায় মানুষদের ওপর জুলুম, অত্যাচার, নিপীড়ন ও শোষণ দেখে কাঙাল হরিনাথ অতিশয় দুঃখ পান। তৎকালীন কুমারখালী ছিল ৫১টি নীলকুঠির প্রধান কার্যালয়। অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় সমকালীন কুমারখালীর ভৌগোলিক অবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ সময় কুমারখালীতে রমরমা নীল ব্যবসা ছিল। হরিনাথ কলকাতা থেকে ফিরে এসে শুভাকাঙ্খীদের সহায়তায় নীলকুঠিতে শিক্ষানবিশ হিসেবে চাকরির সুযোগ পান। তিনি বেশ কিছু দিন নীল কুঠিতে চাকরি করেন। চাকরিকালে তিনি নীলকরদের অত্যাচারের চিত্র স্বচক্ষে অবলোকন করেন। হরিনাথ প্রত্যক্ষ করেন, নীলকুঠির অধিকাংশ কর্মচারী উৎকোচগ্রহণকারী, ঠকবাজ, প্রজাপীড়ক, মিথ্যাবাদী, অসৎচরিত্র ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য সকল অপকর্মে নিযুক্ত (ভারতবর্ষ, ১৩৩৮ ব.: ৭৮০)। স্বভাবতই তাঁর নৈতিকতা, সততা, নীতিবোধ ও দৃঢ় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন। তিনি এ ক্ষেত্রে আপস করলে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারতেন।

তিনি নীলকুঠি থেকে চাকরি ছেড়ে অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের জন্য এক মহাজনের দোকানে গোমস্তার কাজ শুরু করেন। এখানে মহাজনের অন্যায় অভিপ্রায় পূরণ করতে না পারায় ও পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকায় এ কাজ থেকেও তিনি অব্যাহতি নেন। এ সময়ের কথা কাঙাল হরিনাথের ভাষায় স্পষ্ট বোঝা যায়।

তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন, 'এই ঘটনার পর জ্যাঠা মহাশয় দুবেলা যে দুটী অন্ন দিতেন সে অন্নের বরাতও উঠিয়া গেল। এখন আমি যথার্থই অন্নবস্ত্রহীন পথের কাঙাল। প্রতিপালিকা খুল্ল পিতামহী কখনো তাঁহার উদরান্নের অর্দ্ধাংশ (পান্তাভাত, জামির পাতা ও লবণ) প্রদান করেন, কখন কোন ঠাকুরবাড়ির

প্রসাদে এক বেলা উদর পূর্ণ করি। আমার বন্ধু দাদা লোকনাথ কুণ্ডী রাত্রিকালে প্রায়ই আহার প্রদান করিতেন" (কেদারনাথ, ১৩২৪ ব.: ৩৭৭-৩৭৮)।

কাঙাল হরিনাথ নিজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে না পারায় তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করেন। এ যন্ত্রণা থেকে ব্যক্তি উদ্যোগে পুনরায় পড়াশোনা শুরু করেন। কাকতালীয়ভাবে এ সময়ে ব্রাহ্মণসমাজের প্রধান আচার্য্যদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পূর্ববঙ্গের এ অঞ্চলে প্রজাদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য পণ্ডিত দয়ালচাঁদ শিরোমণিকে প্রেরণ করেন। হরিনাথ সৌভাগ্যক্রমে দয়ালচাঁদ শিরোমণির সাহচার্য প্রাপ্ত হন। হরিনাথ পণ্ডিত দয়ালচাঁদ শিরোমণির সহায়তায় পুনরায় পড়াশোনা শুরু করেন। তিনি খুব মনোযোগসহকারে ব্যাকরণ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কিছু সংখ্যা ও ব্রাহ্মধর্মের কিছু গ্রন্থ অধ্যয়ন করে নিজেকে আলোকিত করেন।

কাঙাল হরিনাথ নিজেকে আলোকিত করার পাশাপাশি নিজ গ্রামের অন্যান্য যুব সম্প্রদায়কে পড়ালেখায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য নিজ গৃহে অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি অনুভব করেন, নারী জাতিকে নিরক্ষর রেখে সমাজ খুব বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারে না। তিনি নারী সম্প্রদায়ের জন্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি এ সময়ে প্রত্যক্ষ করেন, জমিদারের লাঠিয়াল বাহিনী, নীলকর, মহাজন ও স্থানীয় প্রশাসনের লোকজন সাধারণ মানুষকে হরহামেশাই অকথ্য অত্যাচার, নির্যাতন ও শোষণ করে তাঁদের জীবনকে দুর্দশাগ্রস্ত করছে। সাধারণ মানুষকে রক্ষার জন্য কাঙাল হরিনাথ সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করেন। তিনি পত্রিকা প্রকাশের জন্য রাজশাহীর রাণী স্বর্ণকুমারী দেবীর অর্থানুকূল্যে কুমারখালীতে ছাপাখানা স্থাপন করেন। এ ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কৃষক, তাঁতি, দিনমজুরসহ প্রভৃতি প্রান্তিক মানুষের স্বার্থ রক্ষা হয় এবং এতে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন কাঙাল হরিনাথ মজুমদার।

২. বাংলায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রচেষ্টা:

১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় বেঙ্গল গেজেট বা ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভাইজার। তৎকালীন বিশিষ্ট মুদ্রণ ব্যবসায়ী জেমস অগাস্টস হিকি দুই হাজার রুপি খরচ করে কলকাতায় ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং তিনি দুই পাতার ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। হিকি ছিলেন নির্ভীক ও সাহসী সাংবাদিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের

রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সত্য প্রকাশে দৃঢ় ও অবিচল থাকতেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে ফোর্ট উইলিয়ামের শাসনকর্তাদের দুর্নীতি, অনিয়ম, চোরাকারবারি প্রভৃতি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি ওয়ারেন হেস্টিংস ও কোম্পানির অফিসারদের নির্যাতনমূলক আচরণ জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। ফলে সরকার হিকির ওপর বিরাগভাজন হয় এবং তাঁকে মামলায় জড়িয়ে গ্রেফতার করে। সরকারের চূড়ান্ত পদক্ষেপে হিকি ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে ছাপাখানা বিক্রি করতে বাধ্য হন। পরবর্তীতে কলকাতা থেকে চারটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকাগুলো হিকির পত্রিকার অনুরূপ ছিল।

১. ক্যালকাটা গেজেট, ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দ
২. সরকারি উদ্যোগে বেঙ্গল গেজেট জার্নাল, ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ।
৩. ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন অব ক্যালকাটা অ্যামিউজমেন্ট, এপ্রিল, ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ।
৪. ক্যালকাটা ক্রনিকল, ফেব্রুয়ারি, ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দ।

১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত পত্রিকাসমূহের জন্য বিপর্যয়কর সময় লক্ষ করা যায়। কোন পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সাথে কোম্পানি সরকারের বিরোধ হলে সে পত্রিকা জোরপূর্বক বন্ধ করে দেয়া হয়। বেঙ্গল গেজেট, বেঙ্গল জার্নাল, ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড পত্রিকাসমূহের কর্তৃপক্ষের সাথে কোম্পানির কর্মকর্তাদের বিরোধের ফলে পত্রিকাসমূহ জোরপূর্বক বন্ধ করে দেয়া হয় এবং জেমস অগাস্টাস হিকিকে মুদ্রণযন্ত্র বিক্রি করে ব্রিটেনে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। বেঙ্গল জার্নাল ও ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড-এর সম্পাদক উইলিয়াম দুয়েনকেও গ্রেফতার করে জোরপূর্বক ব্রিটেনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। আঠারো শতকের শেষভাগে সবগুলো পত্রিকা ছিল হিকির অনুকরণে প্রকাশিত। ফলে পত্রিকাগুলোর সম্পাদকের সাথে কোম্পানির কর্মকর্তাদের অস্বস্তিকর সময় পার হয়। পত্রিকাগুলোতে বিদেশি সংবাদ, পার্লামেন্ট বিতর্ক, ইংল্যান্ডের পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি, স্থানীয় সমাজের খবর, পোয়েটস কর্নার, ফ্যাশন সংক্রান্ত প্রভৃতি বিষয় স্থান পায়। দু'একটি ব্যতিক্রম সংবাদ ছাড়া এদেশের কোনো সংবাদ তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে প্রকাশিত কোনো পত্রিকায় স্থান পেত না। এ সময়ে সবগুলো পত্রিকা ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়।

১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি[৩] কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং এ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন[৪]। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে সমসাময়িককালে ব্রাসি হ্যালহেড, হেনরি সিটস ফরস্টার, উইলিয়াম কেরি, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কোলব্রুক, গোলকনাথ শর্মা, মুনশি নজুরুল্লা আবদুর রহিমসহ প্রভৃতি মনীষীর আবির্ভাব হয়। আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে এ সকল মনীষীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ওয়েলেসলি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টরদের বিনা অনুমতিতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। বোর্ড অব ডিরেক্টর লর্ড ওয়েলেসলিকে কলেজটি বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান করে। কিন্তু ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা ও তা অব্যাহত রাখার বিষয়ে বোর্ড অব ডিরেক্টরের নিকট যৌক্তিকতা উপস্থাপন করেন। অবশেষে ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টর কলেজটি আপাতত চালু রাখার বিষয়ে অনুমতি প্রদান করে। ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে স্যার উইলিয়াম জোন্স-এর সম্পাদনায় বিখ্যাত *Journal of the Asiatic Societz of Bengal* নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এ জার্নালে এশিয়ায় বিলুপ্ত প্রায় পুরাতত্ত্ব, সাহিত্য, সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক ইতিহাস, সভ্যতা-সংক্রান্ত নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইংরেজি ভাষায় গবেষণামূলক প্রবন্ধ নিয়মিত আকারে প্রকাশিত হয়।

১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রথম শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন থেকে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় বাংলাভাষায় 'দিগদর্শন' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। একই বছর মে মাসে শ্রীরামপুর খ্রিষ্টান মিশনারীরা 'সমাচার দর্পণ' নামে সাপ্তাহিক আরেকটি বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করে। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে বাঙালি মালিকানাধীন প্রথম সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজেট' গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকাটিতে মূলত বাংলা ভাষায় সংবাদ প্রকাশিত হলেও মাঝে মাঝে হিন্দি এবং ইংরেজিতে নিবন্ধ প্রকাশিত হতো। ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দের ১ মে জেমস সিল্ক বাকিংহামের সম্পাদনায় 'ক্যালকাটা জার্নাল' অর্ধ-

---

[৩] লর্ড ওয়েলেসলি ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জুন আয়ারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল পদে নিযুক্ত হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ব্যবস্থার প্রচলন করেন। তিনি সংবাদপত্রের ওপর বিধিনিষেধ আরোগ করে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন। তিনি ১৮৪২ সালে লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

[৪] *The Calcutta Monthly Journal,* November, 1831: 151-155.

সাপ্তাহিক থেকে দৈনিক এ প্রকাশিত হয়। ফলে বলা যায় 'ক্যালকাটা জার্নাল'ই ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র।

কলকাতার বাইরে পূর্ববঙ্গের রংপুর থেকে ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দ প্রথম সাপ্তাহিক 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' প্রকাশিত হয়। এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কুণ্ডির জমিদার কালীচরণ রায়চৌধুরী। ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন গুরুচরণ রায়। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে এ. আর ফোর্বস-এর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম ইংরেজি সাপ্তাহিকের নাম ছিল 'ঢাকা নিউজ'।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী থেকে হাতে লেখা 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' প্রকাশিত হয়। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' সম্পাদনার পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকায় লেখালেখি করতেন (সতীশচন্দ্র, ১৩০৮ ব.: ২)। প্রথমত কাঙাল হরিনাথ ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' কোলকাতার গিরিশচন্দ্র-এর মালিকাধীন 'বিদ্যারত্ন মুদ্রাযন্ত্র' থেকে ছাপিয়ে ১ পয়সা মূল্যে প্রকাশ করেন (Aman, 2016: 43)। এটি ছিল মূলত ইংরেজবিরোধী গ্রামীণ বাংলার জনসাধারণের পত্রিকা। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে কাঙাল হরিনাথ কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাপাখানা থেকেই "গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা" প্রথমে পাক্ষিক, পরে সাপ্তাহিক আকারে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় (অশোক, ২০১২: ৫৫)।

বাংলায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই ইউরোপ-আমেরিকায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইউরোপে পনেরো শতকের পরে মুদ্রণশিল্পের বিকাশ লাভ করে। ১৪৭০ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্স ও হল্যান্ডে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতালির ভেনিসে ১৪৮৮ খ্রিষ্টাব্দে অলডাস প্রথম মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন। এমনিভাবে সুইজারল্যান্ডে ১৪৬৮ খ্রিষ্টাব্দ, বেলজিয়াম ও হাঙ্গেরিতে ১৪৭৩ খ্রিষ্টাব্দ, পর্তুগালে ১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দ, বুলগেরিয়ায় ১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দ, স্কটল্যান্ড ও রুমানিয়ায় ১৫০৮ খ্রিষ্টাব্দ, আয়ারল্যান্ডে ১৫৫১ খ্রিষ্টাব্দ, রাশিয়ায় ১৫৫৩ খ্রিষ্টাব্দ ও আমেরিকায় ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দ ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যায় (রাব্বি, ২০০২: ১৪-১৫)। ভারতবর্ষে ১৭৮০ থেকে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত পত্রপত্রিকার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো।

সারণি-১

১৭৮০-১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বংলায় প্রকাশিত পত্রপত্রিকা ও সম্পাদকের তালিকা, (সৌমিত্র, ২০০৪: ৫২৪)।

ক্র.নং	পত্রপত্রিকার নাম	প্রকাশকাল	সম্পাদকের নাম
০১	বেঙ্গল গেজেট	১৭৮০	জেমস অগাস্টাস হিকি
০২	দিগদর্শন	১৮১৮	জন ক্লার্ক মার্শম্যান
০৩	বাঙ্গাল গেজেট	১৮১৮	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য
০৪	সমাচার দর্পণ	১৮১৮	জে. সি. মার্শম্যান
০৫	ব্রাহ্মণ সেবধি	১৮২১	রাজা রামমোহন রায়
০৬	সংবাদ কৌমুদী	১৮২১	রাজা রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
০৭	মীরাতুল আখবার	১৮২২	রাজা রামমোহন রায়
০৮	সমাচার চন্দ্রিকা	১৮২২	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
০৯	বঙ্গদূত	১৮২৯	নীলমণি হালদার
১০	জ্ঞানান্বেষণ	১৮৩১	দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
১১	সংবাদ প্রভাকর (সাপ্তাহিক)	১৮৩১	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
১২	সমাচার সভারাজেন্দ্র	১৮৩১	শেখ আলিমুল-াহ
১৩	সংবাদ রত্নাবলী	১৮৩২	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
১৪	তত্ত্ববোধিনী	১৮৪৩	অক্ষয়কুমার দত্ত
১৫	এডুকেশন গেজেট	১৮৪৬	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬	পাষণ্ড পীড়ন	১৮৪৬	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
১৭	রঙ্গপুর বার্তাবহ	১৮৪৭	গুণচরণ রায়
১৮	সংবাদ সাধুরঞ্জন	১৮৪৮	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
১৯	সংবাদ রসসাগর	১৮৫০	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
২০	সর্বশুভকরী পত্রিকা	১৮৫০	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
২১	বিবিধার্থ সংগ্রহ	১৮৫১	রাজেন্দ্রলাল মিত্র
২২	মাসিক পত্রিকা	১৮৫৪	প্যারিচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার
২৩	সাপ্তাহিক বার্তাবহ	১৮৫৬	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
২৪	ঢাকা প্রকাশ	১৮৬১	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
২৫	গ্রাম বার্ত্তা প্রকাশিকা	১৮৬৩	কাঙাল হরিনাথ মজুমদার
২৬	অমৃতবাজার পত্রিকা	১৮৬৮	বসন্ত কুমার ঘোষ ও শিশির কুমার ঘোষ

২৭	শুভ সাধিনী	১৮৭০	কালীপ্রসন্ন ঘোষ
২৮	বঙ্গদর্শন	১৮৭২	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২৯	আজিজন নেহার	১৮৭৪	মীর মশাররফ হোসেন
৩০	বান্ধব	১৮৭৪	কালীপ্রসন্ন ঘোষ
৩১	ভারতী	১৮৭৭	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩২	সুধাকর	১৮৮৯	শেখ আবদুর রহিম
৩৩	সাহিত্য	১৮৯০	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
৩৪	হিতকরী	১৮৯০	মীর মশাররফ হোসেন
৩৫	ইসলাম প্রচার	১৮৯১	মো. রেয়াজদ্দীন
৩৬	সাধনা	১৮৯১	সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩৭	মিহির	১৮৯২	শেখ আবদুর রহিম
৩৮	মিহির ও সুধাকর	১৮৯৫	শেখ আবদুর রহিম
৩৯	হাফেজ	১৮৯৭	শেখ আবদুর রহিম
৪০	কোহিনুর	১৮৯৮	মহাম্মদ রওশন আলী
৪১	লহরী	১৯০০	মোজাম্মেল হক

বর্ণিত সারণি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ক্রমিক নম্বর ১৭-তে ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের রংপুর থেকে গুরুচরণ রায়ের সম্পাদনায় "রঙ্গপুর বার্তাবহ" প্রকাশিত হয়। রংপুর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "রঙ্গপুর বার্তাবহ"ই পূর্ববঙ্গে প্রকাশিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বা সাময়িকী। এ সংবাদপত্রটি প্রতি মঙ্গলবার প্রায় ১০০ কপি ছাপানো হতো। এর বার্ষিক চাঁদা ছিল ৬ টাকা। ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে সম্পাদক গুরুচরণ রায় মৃত্যুবরণ করলে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কুণ্ডির জমিদার কালীচরণ রায়চৌধুরী (চক্রবর্তী, ২০০১: ১)। পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য স্থাপিত মুদ্রণযন্ত্রটি উপমহাদেশের প্রাচীনতম মুদ্রণযন্ত্রটি হিসেবে ঐতিহাসিকদের নিকট সমাদৃত। পত্রিকাটি নারী শিক্ষার গুরুত্ব, নারী জাগরণ, সমাজ সচেতনতা প্রভৃতি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতো (সমরপাল, ১৯৯৫: ২২)। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের মুদ্রণযন্ত্র ও সংবাদপত্র প্রকাশ সংক্রান্ত কালো আইনের কারণে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ জুন 'রঙ্গপুর বার্তাবহ'-এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায় (মামুন, ১৯৮৫: ৭২)।

১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, সমাজ সংস্কারক, নারী শিক্ষার অগ্রদূত, বিখ্যাত সম্পাদক কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বর্ণিত

সারণির ক্রমিক নম্বর ২৫-এ পূর্ববঙ্গের তৎকালীন নদীয়া জেলার (বর্তমান কুষ্টিয়া জেলা) কুমারখালী মহকুমা থেকে প্রকাশিত হয় "গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা"। গ্রামীণ জনপদ থেকে প্রকাশিত এটি পূর্ববঙ্গের ইতিহাসে প্রথম সংবাদপত্র। এটি ছিল দরিদ্র ও কৃষককুলের একমাত্র মুখপাত্র। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার আমৃত্যু এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি পত্রিকা প্রকাশের জন্য কুমারখালীতে মুদ্রণযন্ত্র বা ছাপাখানা স্থাপন করেন। ছাপাখানার ইতিহাসে গুরুত্ব বিবেচনায় কাঙাল হরিনাথের স্মৃতি ধরে রাখতে সরকারি অর্থায়নে ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান কুমারখালীতে 'সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘর' প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি এ জাদুঘরে কাঙাল হরিনাথ মজুমদার কর্তৃক ব্যবহৃত ঐতিহাসিক মুদ্রণযন্ত্রটি এক চুক্তির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়[৫]। এ নিদর্শনটি স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য সাধারণ দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। সাধারণ দর্শনার্থী ও গবেষকেরা এ মুদ্রণযন্ত্রটি অবলোকন করে অতীত ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন এবং দর্শনার্থীদের মধ্যে ঐতিহ্য সচেনতা বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা হয়।

আলোকচিত্র-০১: পাখির চোখে সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘর কমপ্লেক্স, কুমারখালী, কুষ্টিয়া। ছবি কৃতজ্ঞতাঃ সা.ফারহান।

[৫] বা.জা.জা. সংগ্রহ নম্বর : ০৮.০০.০২২.২০২৩.০০০০১।

৩. কাঙাল হরিনাথের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পটভূমি :

কাঙাল হরিনাথ বাল্যকাল থেকে অতি দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে বড় হয়েছেন। তাঁর আর্থিক দীনতা থাকলে মনের তীব্র স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাঁকে কখনো স্থির থাকতে দেয়নি। এ কথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর চিন্তা ও কর্ম সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করেছে। তিনি ১২৮০ বঙ্গাব্দে (১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দ) পত্রিকা প্রকাশের জন্য কুমারখালীতে বৃহদাকার মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন (জলধর, ১৩২০: ১২)। যেটি কাঙাল হরিনাথের এম. এন প্রেস হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করে। এ মুদ্রণযন্ত্র বা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পটভূমি নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো:

৩.১ শিক্ষার প্রসার ও সমাজ সংস্কার :

হরিনাথ নিজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে না পারায় ক্ষোভ ও বঞ্চনা থেকে নিজ গ্রামের বালকদের শিক্ষার জন্য একটি বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সময়টি ছিল ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি (জলধর, ১৩২০ ব.: ৫)। স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে কাঙাল হরিনাথ বিনা বেতনে শিক্ষকতা করেন। তখনো আধুনিক শিক্ষার তেমন প্রচলন হয়নি। তখন সরকারিভাবে কতিপয় স্থানে দু-একটি সাধারণ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। কাঙাল হরিনাথ নিজ প্রতিভাবলে ইংরেজি শিক্ষার অনুকরণে সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি শিক্ষা প্রদানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। হরিনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্কুলের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ এ স্কুল পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। যাদবচন্দ্র কুণ্ডুকে এ কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হয়। এ কমিটি স্থানীয়দের নিকট হতে চাঁদা সংগ্রহ করে হরিনাথের ৬ টাকা বেতন প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শিতা দেখে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের স্কুল পরিদর্শক উড্রো ও মার্টিন প্রমুখ স্কুলের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এ স্কুলে সরকারি সহায়তা প্রদানের সুপারিশ করেন। এ সময় স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। স্কুল কমিটি হরিনাথের মাসিক সম্মানী বৃদ্ধি করে ১২ টাকা নির্ধারণ করেন। তদানীন্তন সরকারের স্কুল ইন্সপেক্টর কমিটি নীলমণি সেন মহাশয় আবারো স্কুল পরিদর্শন করে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তখন স্কুলে সরকারি সাহায্য আসলে কমিটি হরিনাথের বেতন ২০ টাকা নির্ধারণ করেন। কিন্তু তিনি ২০ টাকা না নিয়ে নিজে ১৫ টাকা নিয়ে অবশিষ্ট টাকা অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে বিতরণ করেন। এ বিষয়ে কাঙাল হরিনাথ বলেন, "আমি ২০

টাকা গ্রহণ করিলে, নিম্নশ্রেণীস্থ শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। আমি ১৫ টাকা গ্রহণ করিয়া নিম্নশ্রেণীস্থ শিক্ষকদিগের যথাযোগ্য বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া সুখী হইলাম। এই ১৫ টাকা পর্য্যন্তই আমার জীবনের বৈতনিক উপার্জ্জন"।

হরিনাথ শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাল্যবন্ধু মথুরানাথের বাড়িতে নৈশ বিদ্যালয় ও পঠন সমিতি গঠন করেন। প্রতি শনিবার বিকাল ৪টায় সমিতির কার্য্যক্রম শুরু হতো। তিনি সংবাদপ্রভাকর ও এডুকেশন গেজেট পালাক্রমে পাঠের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে স্থানীয় যুবকদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং পড়ালেখায় মনোযোগী হয়। এ নৈশ বিদ্যালয়ে মথুরানাথ ও গোপালচন্দ্র সান্যাল ইংরেজি এবং কাঙাল হরিনাথ বাংলা পড়াতেন। এ নৈশ স্কুলে পড়ে পরবর্তীতে অনেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়। কাঙাল হরিনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা খুব গুরুত্ব সহকারে পড়তেন। এ সময় তিনি বাড়িতে বসে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' সংগ্রহ করে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন (সতীশচন্দ্র, ১৩০৮ ব.: ২)। এরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে শিক্ষার প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ তৈরি হয়। পড়তে পড়তে একসময় লেখালেখির প্রতি তাঁর ঝোঁক তৈরি হয়।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২১ অক্টোবর বিখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকায় কাঙাল হরিনাথের লেখা 'টাকা' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। যেটি ছিল হরিনাথের সংবাদপত্রে ছাপা প্রথম প্রতিবেদন। এ সময় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাথে হরিনাথের পরিচয় ও সখ্য গড়ে ওঠে। কাঙাল হরিনাথ সংবাদপ্রভাকর পত্রিকায় গ্রামের প্রজাদের ওপর জমিদার, নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনি, কৃষক, তাঁতি, মজুরে দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে নিয়মিত লেখার চেষ্টা করেন।

১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে/১৭৮১ বঙ্গাব্দে কাঙাল হরিনাথ বিখ্যাত উপন্যাস 'বিজয় বসন্ত' রচনা করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এ বিষয়ে হরিনাথ বর্ণনা করেন-"যখন দয়ার সাগর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় সুললিত বাঙ্গলা গদ্যে পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন, সেই সময়ে হরিনাথ নদীয়া জেলার একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে (কুমারখালী) বসিয়া 'বিজয় বসন্ত' রচনা করেন। হরিনাথ ইংরেজি জানিতেন না, ইংরেজি গ্রন্থের কোনোভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পুস্তক লেখা তাঁহার ঘটিয়া উঠে নাই; তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে সেই সময়ে 'বিজয় বসন্ত' প্রকাশিত করিয়া পাঠকসমাজের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছেন। বলতে কি, তাহার এই পুস্তক এই

শ্রেণির উপন্যাসের মধ্যে মৌলিকতা, মধুরতা ও প্রকৃত কাব্যগুণে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল"।

হরিনাথ কুমারখালীর সাঁওতা গ্রামের স্বর্ণময়ীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সাঁওতা গ্রাম ছিল বিখ্যাত বাউল সাধক লালন ফকিরের বসতভিটার নিকটবর্তী গ্রাম। হরিনাথ-স্বর্ণময়ী দম্পত্তির ৫ জন পুত্র ও ৩ জন কন্যাসহ সর্বমোট ৮ জন সন্তান ছিল। পুত্রদের নাম যথাক্রমে–সতীশচন্দ্র, বাণীশচন্দ্র, বিজয়, বসন্ত এবং সুরেন্দ্র। কন্যাদের নাম যথাক্রমে–আনন্দময়ী, চপলা ও যোগমায়া। পুত্রদের মধ্যে বিজয় ও বসন্ত শৈশবেই পরলোকগত হন। কাঙাল হরিনাথ মূলত সে কারণে তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাসের নাম 'বিজয় বসন্ত' নামকরণ করেন। হরিনাথের অন্য লেখাতেও নিজ সন্তানদের নামের সাথে মিল রেখে নামকরণ করা হয়। হরিনাথের জীবনাবসনের পর তাঁর শিষ্য জলধর সেন বলেন, "হরিনাথ তাঁর সাধবী স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণের জন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই, শুধু আছে তাঁহার নাম আর আছে তাঁহার সারবান গ্রন্থরাশি" (অক্ষয়কুমার, ১৩০৩ ব.: ২০)। কাঙাল হরিনাথ যখন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন তখন পাঠ্যপুস্তক খুব একটা সহজলভ্য ছিল না। তিনি নিজে হাতে লিখে তা ছাত্রদের পাঠের ব্যবস্থা করতেন। এ সব স্কুল সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের মধ্যে জাগরণের সৃষ্টি করে এবং শিক্ষার প্রতি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপুল আগ্রহ তৈরি হয়।

৩.২ নারী শিক্ষার উন্নয়নে কাঙাল হরিনাথের প্রচেষ্টা

কাঙাল হরিনাথের সবচেয়ে সাহসী ও সময়োপযোগী প্রচেষ্টা হলো ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে ভদ্রাসনের চণ্ডীমণ্ডপ গৃহে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও তার প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ। হরিনাথ যে সময়ে মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন সে সময়ে নারী শিক্ষার কথা উঠলে সমাজপতিরা আতঙ্কিত হতেন। তিনি গ্রামের নারী সমাজের উন্নয়ন ও কুসংস্কার দূর করার জন্য নারীকুলের শিক্ষার গুরুত্ব অনুভব করেন। তৎকালীন সমাজে একটা ধারণা প্রচলিত ছিল, নারী শিক্ষিত হলে বিধবা হয়, পথভ্রষ্ট হয়, সমাজ নষ্ট হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। যেখানে স্বয়ং রাজধানীতেই নারী শিক্ষার খুব একটা প্রচলন ছিল না সেখানে একটা অজপাড়া গ্রামে নারীদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা ছিল অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর ব্যাপার। তিনি অনুভব করেন, সমাজের প্রায় অর্ধেক নারী, সমাজের অর্ধেক নারীকে আলোকিত না করলে সমাজ অন্ধকারই থেকে যাবে। বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এলাকায় নব উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। প্রথাগত সমাজের একপক্ষ হরিনাথের এমন উদ্যোগকে খুব সহজভাবে

নেয়নি। সমাজের প্রভাবশালী সুশীল সমাজ 'সমাজ উচ্ছন্নে গেল' এমন মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁরা নারী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন এবং নারী শিক্ষার বিষয়ে সামাজিকভাবে প্রবল বিরোধিতা করেন।

প্যারিচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা'র আগস্ট ১৬, ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে প্রকাশিত সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষার সমার্থক হরিহরের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতীর কথোপকথন থেকে সমকালীন নারী শিক্ষার চিত্র স্পষ্ট হয়। তাঁদের বক্তব্যটি ছিল নিম্নরূপ- "মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখে কি করবে? সে কি চাকরি করে টাকা আনবে? মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে বরং লোকে নিন্দা করবে। রবিবার দিন দিদির বাড়ি গিয়াছিনু সেখানে মাসী-পিসী সকলেই এসেছিলেন, তাদের কাছে মেয়ের লেখাপড়ার কথা বলিলে তাঁহারা সকলে বললেন, মেয়েমানুষের লেখাপড়া শেখায় কাজ কি? আবার কেউ বললে মেয়েমানুষ লেখাপড়া শিখলে রাঁড় হয়। মাগো সে কথা শুনে অবধি আমার মনটা ধুক ধুক করছে। আমার মেয়ে অমনি থাকুক। সে কয়দিন পাঠশালে গিয়াছিল তার দোষ কাটাইবার জন্য চূড়ামণিকে দিয়া ঠাকুরের কাছে তুলসী দেওয়াবো" (স্বপন, ১৯৯৫: ৩০৫)।

কাঙাল হরিনাথ এ সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে নারীদের মধ্যে শিক্ষায় আগ্রহী করতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। দেশীয় ও বৈশ্বিক পট পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে হরিনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের কলেবর বৃদ্ধি পায়। হরিনাথের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টি কালের সাক্ষী হিসেবে আজোবধি টিকে আছে। বর্তমানে বিদ্যালয়টির নাম 'কুমারখালী সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়'।

আলোকচিত্র-০২: কাঙাল হরিনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কুমারখালী পাইলট বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ছবি কৃতজ্ঞতা: সা. ফারহান।

কাঙাল হরিনাথ প্রথাগত সমাজের প্রতিষ্ঠিত ধারণার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করেন নারী শিক্ষায় তিনি অসাধারণ সফলতা লাভ করেন। তিনি নারী শিক্ষার উন্নতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালনের করেন। নারী শিক্ষার জন্য তিনি সমাজপতিদের চক্ষুশূলে পরিণত হন। এরূপ আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় নারী শিক্ষা নারী জাগরণের সৃষ্টি করে। ফলে সমাজের প্রায় সকল সূচকে অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটে এবং কাঙাল হরিনাথ সমাজে অনন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

৩.৩ গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'-এর আত্মপ্রকাশ :

কাঙাল হরিনাথ কর্মজীবনে প্রথাগত শিক্ষক হয়ে কিংবা নীলকুঠিতে চাকরি করে নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। এ জায়গায় কাঙাল হরিনাথ ব্যতিক্রম ছিলেন। সময়টা ছিল জমিদার ও নীলকরদের। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুমারখালী ছিল ৫১টি নীলকুঠির প্রধান কার্যালয়। নীলকুঠিতে হরিনাথের চাকরি করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সে সময়ে নীলকররা জোর করে কৃষকদের অর্থলগ্নি দিয়ে নীলচাষ করতে বাধ্য করত। নীলকরদের কথা না শুনলে কৃষকদের হয়রানি ও নির্যাতন করত। দিনে দিনে নীলকরদের নির্যাতনের মাত্রা অসহ্য পর্যায়ে পৌঁছালে 'নীল বিদ্রোহ' শুরু হয়। নীলকর, মহাজন, জমিদারদের অত্যাচারের কাহিনি ইংরেজ সরকারের দৃষ্টিগোচর করতে হরিনাথ 'সংবাদপ্রভাকর' এর পাশাপাশি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় লিখতেন।

লেখালেখি তাঁর নেশায় পরিণত হয়। হরিনাথের বাল্যবন্ধু মথুরানাথ সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। মথুরানাথ নিজে ইংরেজি ভাষায় লেখালেখি করতেন। লেখালেখির সূত্রধরে তাঁদের 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সম্পাদক হরিশ্চন্দ্রের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। হরিনাথ নীলকরদের অত্যাচার ও মথুরানাথ সম্পর্কে বলেন, 'সাধ্য ততদূর না থাকুক, প্রজার প্রতি নীলকরের অত্যাচার যাহাতে নিবারিত হয়, তাহার উপায় চিন্তাকরণ মথুরের ও আমার নিত্যব্রত ছিল'। কাঙাল হরিনাথ ও মথুরানাথের প্রচেষ্টা ছিল সংবাদপত্রে লেখালেখির মাধ্যমে জমিদার ও নীলকরদের দ্বারা কৃষক-প্রজাদের ওপর নিপীড়নের তথ্য কোম্পানি সরকারের ঊর্ধ্বতন মহলের দৃষ্টিগোচর করানো।

হরিনাথের প্রেরিত গ্রামীণ সংবাদ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকায় যত্নসহকারে ছাপালেও নারী শিক্ষার পক্ষে লেখা ছাপা হতো না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নারী শিক্ষার ব্যাপারে রক্ষণশীল ছিলেন। নারী শিক্ষার প্রসারের বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে হরিনাথের মতের মিল ছিল না এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিরোধ হয়। হরিনাথ নারী শিক্ষা প্রসারের পক্ষে অত্যন্ত দৃঢ় অবস্থান নেন। অত্যাচারিত প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়েও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাথে হরিনাথের মতোবিরোধ হয়। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সাথেও এ বিষয়ে বিরোধ হয় (চিত্ত, ১৯৯২: ৬০)। তিনি সবসময়ই প্রজা হিতৈষী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। এরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে হরিনাথ নিজে সংবাদপত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলেন। আর্থিক অসচ্ছলতা ও অন্যান্য ঝুঁকি নিয়েই তিনি ১২৭০ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ (এপ্রিল, ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দ)-এ প্রথম ঐতিহাসিক 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' প্রকাশ করেন। এটি তখন মাসিক সংস্করণ ছিল। পত্রিকাটির মাসিক সংস্করণে হরিনাথের মন ভরছিল না। ফলে তিনি ১২৭৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখে (এপ্রিল, ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দ) 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পাক্ষিক সংস্করণ প্রকাশ করেন। এরপরের বছরই অর্থাৎ ১২৭৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখে (এপ্রিল, ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দ) পত্রিকাটি সাপ্তাহিক সংস্করণ প্রকাশ করেন। 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পত্রিকা প্রকাশে এ ছাপাখানাটি অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করে।

৪. ছাপাখানা স্থাপন ও এর প্রাথমিক বিবরণ:

শিশির কুমার ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত 'অমৃতবাজার'[৬] পত্রিকার ১২৮০ বঙ্গাব্দের ১৭ শ্রাবণ এ মুদ্রণযন্ত্র নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ সংবাদ থেকে জানা যায় এ মুদ্রণযন্ত্রটির ওজন প্রায় ৩০/৩৫ মণ। এটি পরিচালনা করতে ৩/৪ জনের প্রয়োজন হয়। লন্ডনের ১০ দিমবারি স্ট্রিটের ক্লাইমার ডিক্সন এ্যান্ড কোম্পানি থেকে কলম্বিয়া প্রেস মডেলের ১৭০৬ নম্বর মুদ্রণযন্ত্রটি তৈরি হয় ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে। এডওয়ার্ড বিভান এ যন্ত্রের পেটেন্ট করেন।

আলোকচিত্র-০৩ : কাঙাল হরিনাথের বসতভিটা, যেখানে মুদ্রণযন্ত্রটি স্থাপন করা হয় এবং এখান থেকেই মুদ্রণযন্ত্রটি সংগ্রহ করে জাদুঘরে স্থানান্তর করা হয়। ছবি কৃতজ্ঞতা: সা. ফারহান।

[৬] ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার পারিবারিক প্রচেষ্টায় 'অমৃতবাজার' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। শিশির কুমার রায়-এর সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাটি তৎকালীন যশোর জেলার মাগুরা থেকে প্রকাশিত হয়। এটির বার্ষিক মূল্য ছিল পাঁচ টাকা। তিন টাকা ডাক মাশুল। পত্রিকাটি ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে বন্ধ হয়ে যায়। শিশির কুমার কলকাতায় চলে যান। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ২ এপ্রিল কলকাতা থেকে পুনরায় বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে 'অমৃতবাজার' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'অমৃতবাজার' ইংরেজ অপশাসনের বিরুদ্ধে লেখালেখির কারণে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চ ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট জারি করে।

সম্প্রতি মুদ্রণযন্ত্রটি কাঙাল হরিনাথের বসতবাড়ি থেকে জাদুঘরে স্থানান্তর করা হয়। মুদ্রণযন্ত্রটির আকার-আকৃতি পরিমাপ করা হয়। এটির উচ্চতা ২২৮ সে.মি., দৈর্ঘ্য ১৬০ সে.মি. এবং প্রস্থ ১৪৭ সে.মি. বিশিষ্ট। মুদ্রণযন্ত্রটি স্থানান্তরের জন্য ওঠানো-নামানোর কাজে কর্মরত শ্রমিক ও গবেষকবৃন্দ অনুমান করেন এটির ওজন ১.৫ টন। বিবেচ্য এ যন্ত্রে কোনো সন-তারিখ লেখা নেই। তবে যন্ত্রের মধ্যভাগে গোলাকার একটা জায়গায় সন-তারিখ ও উৎপাদনকারী কোম্পানির নাম না পাওয়া গেলেও গোলাকার জায়গায় পৃথক একটি চাকতিতে সন-তারিখ ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটির আকার আকৃতি ও অন্যান্য তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে আমেরিকার কলম্বিয়া প্রেস মডেলের সাথে হুবহু সাদৃশ্য দেখা যায়। মুদ্রণযন্ত্রের ঊর্ধ্বভাগে গাছের ওপর দণ্ডায়মান ৪৩.৫৮ সে.মি. উচ্চ এবং ৪৩.৫৮ সে.মি. দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি অলংকৃত মনোরম দৃশ্যের ঈগল পাখির প্রতিকৃতি রয়েছে। এ যন্ত্রের উভয় পাশে দু'টি এবং ভার হিসেবে ১টি ডলফিনের প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। যন্ত্রের উভয় পাশে চারটি লাঠি যার প্রত্যেকটিতে ৫৩.৩৪ সে.মি.বিশিষ্ট দীর্ঘ পেঁচানো সাপের প্রতিকৃতি দেখা যায়। মুদ্রণযন্ত্রের উভয় পাশে মোট ৪টি চক্র রয়েছে। এ যন্ত্রের পেছনের দিকে ঢালাই লোহা দ্বারা লাগানো রাজকীয় পোশাক পরিহিত অস্ত্রসহ দণ্ডায়মান নারী মূর্তির প্রতিকৃতি দেখা যায় যার উচ্চতা ১৯.০৫ সে.মি. এবং দৈর্ঘ্য ১১.৪৩ সে.মি.। মূল যন্ত্রটি শক্ত চার পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে, প্রত্যেক পা ৪৮.২৬ সে.মি. বিশিষ্ট এবং পায়ের নিম্নভাগে বাঘের থাবা খোদাই করা হয়েছে।

৫. শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ছাপাখানার ভূমিকা

কাঙাল হরিনাথের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ ছিল পত্রিকা প্রকাশ। এ ছাপাখানার মাধ্যমে তিনি ১২৭০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ১২৯২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন (এপ্রিল, ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দ-অক্টোবর, ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত দীর্ঘ মোট সাড়ে বাইশ বছর 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি পত্রিকা প্রকাশের পাশাপাশি এ দীর্ঘ সময়ে একটি সাহিত্য গোষ্ঠী তৈরি করেন। যারা পরে সাহিত্যাঙ্গনে উজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছেন এবং বিশেষ খ্যতি অর্জন করেন। হরিনাথের এম এন প্রেস ও 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'-এর কল্যাণে জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৯), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০), শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব

(১৮৬০-১৯১৩), চন্দ্রশেখর, মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ সাহিত্যাঙ্গনে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বলেন, 'হরিনাথের আদর্শে, হরিনাথের উপদেশে, হরিনাথের সহায়তায় কুমারখালী প্রদেশে অনেকের হৃদয়ে সাহিত্যানুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছিল' (মৈত্রেয়, ১৩০৩ ব.: ২৪)। জলধর সেন এ বিষয়ে বলেন, "আমার শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, জীবনপথের একমাত্র পথপ্রদর্শক" (বারিদবরণ, ১৯৯১ : ১৫০)। হরিনাথ সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাহিত্য রচনায় অনন্য ভূমিকা রেখেছেন। বিখ্যাত বাউলসম্রাট লালন সাঁইজির 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' গানসহ মোট ২১টি গান সর্বপ্রথম কাগজে ছাপা হয় এ যন্ত্রের মাধ্যমে। কাঙাল-পুত্র সতীষ চন্দ্র মজুমদার ও সুসাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেনের যৌথ সম্পাদনায় এম এন প্রেস থেকে ছাপাক্ষরে প্রকাশ হতো বিখ্যাত হিতকরী (১৮৯০-১৯৯১) পত্রিকা (পাক্ষিক পত্রিকা, ১৫ বৈশাখ, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ)।

আলোকচিত্র-০৪: সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘরে রক্ষিত ঐতিহাসিক প্রেস মেশিন। ছবি কৃতজ্ঞতা: সা. ফারহান।

কাঙাল হরিনাথ মজুমদার একাধারে পদ্য বা ভাব কবিতা, পাঁচালি, নাটক, আখ্যান, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে সাহিত্য রচনা করে এ যন্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। তাঁর বিজয়া (পাঁচালি, ১৮৬৯), কবিকল্প (দক্ষযজ্ঞবিষয়ক কাহিনি, ১৮৭০), অক্রূরসংবাদ (গীতাভিনয়, ১৮৭৩), সাবিত্রী নাটিকা (গীতাভিনয়, ১৮৭৪), ভাবোচ্ছ্বাস (নাটক, ১৩৩১ব,), জটিল কিশোর (নাটক), কৃষ্ণকালী লীলা (পাঁচালি, ১৩০৫ ব.), কংসবধ (পাঁচালি), প্রভাসমিলন (পাঁচালি), নন্দ বিদায় (পাঁচালি), পাষাণোদ্ধার (পাঁচালি), রামলীলা (পাঁচালি), শিববিবাহ (পাঁচালি), নিমাই সন্ন্যাস (পাঁচালি), গুপ্তনিশুম্ভ বধ (পাঁচালি), অশোক (পাঁচালি), পদ্যপুন্ডরীক (পদ্য, ১৮৬২), আধ্যাত্ম-আগমনী (সঙ্গীত, ১৮৯৫), আগমনী (ধমীয় সঙ্গীত, ১৮৮৫), পরমার্থগাথা (ধর্মীয় সঙ্গীত), শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম (নামকীর্তন, ১৯৬৬), আনন্দময়ী মায়ের আগমনে আনন্দ-উৎসব (তত্ত্বসঙ্গীত, ১৯৬৩), ভারতোদ্ধার (প্রবন্ধ), সেবা ও সেবাপরাধ (প্রবন্ধ), ঠানদিদির বৈঠক (আলোচনা প্রবন্ধ), পৌত্তলিকতা প্রণেতা (প্রবন্ধ), কাঙাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের গীতাবলী (১৮৮৬-১৮৯৪), কাঙাল ফিকিরচাঁদের বাউলসঙ্গীত (১৯১৬), ব্রহ্মাণ্ডবেদ (ধর্মসাধনতত্ত্ব, ১৮৮৫-১৮৯৫, ৬ খণ্ড), মাতৃমহিমা (আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ, ১৩০৪ ব.), চারুচরিত্র (পাঠ্যপুস্তক, ১২৬৯), কবিতা কৌমুদি (১৮৬৬), বিজয়বসন্ত (উপন্যাস, ১৮৫৯), চিত্তচপলা (আখ্যান, ১৮৭৬) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা ও সংকলন সমকালীন শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে উজ্জ্বল অবদানের কথা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ছাপাখানা স্থাপনের ফলে তিনি এতগুলো গ্রন্থ রচনা করতে উৎসাহিত হন। কাঙাল হরিনাথ প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাটির মাধ্যমে কুষ্টিয়া অঞ্চলের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি উৎকর্ষ লাভ করে তা সন্দেহাতীতভাবে প্রকাশ করে।

উপসংহার :

ছাপাখানার ইতিহাস-ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ কাঙাল হরিনাথের ঐতিহাসিক এম এন প্রেস বা মথুরানাথ ছাপাখানা। উনিশ শতকের সত্তরের দশকে কুমারখালীতে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন এবং 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা' প্রকাশ একটি বিস্ময়কর ঘটনা। কাঙাল হরিনাথ ব্যক্তিগত জীবনে খুব একটা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে পারেননি। আর্থিক দীনতার কারণে খুব স্বল্প সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অভাব-অনটনকে আমলে না নিয়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় পড়ালেখা চালিয়ে গেছেন।

কাঙাল হরিনাথ মেধা ও বুদ্ধির জোরে তৎকালীন নীলকুঠিতে চাকরি পেলেও নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন এবং আর্থিক দৈন্যদশা সত্ত্বেও নিম্নবর্গের পক্ষ নিয়ে চাকরি ছেড়েছেন। তিনি চাইলে এ চাকরি দিয়ে আরাম আয়েশে জীবনযাপন করতে পারতেন এবং ধনিক শ্রেণিতে পরিণত হতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে পক্ষান্তরে গ্রামবাসীকে শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। শিক্ষা ছাড়া যে এ জাতির ভাগ্য উন্নয়ন হবে না তা তিনি অনুভব করেছিলেন। তাঁর নিজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সুযোগ না হলেও তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং গ্রামের মানুষদের শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন। পরক্ষণে তিনি চিন্তা করলেন, সমাজের প্রায় অর্ধেক মানুষ নারী। নারীদের বাদ দিয়ে সমাজের উন্নয়ন সম্ভব না। তৎকালীন সময়ে রক্ষণশীল হিন্দু ও মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষার প্রচলন ছিল না। তিনি সামাজিক প্রতিকূলতা অতিক্রম করে নারী শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। হতাশা, দুঃখ, অপমান, দারিদ্র্য প্রভৃতি কোনো কিছুই তাঁর এ উদ্যোগকে বন্ধ করে দিতে পারেনি। নারী শিক্ষায় কাঙাল হরিনাথের ভূমিকা গ্রহণের ফলে সমকালীন আর্থসামাজিক বাস্তবতায় সংস্কৃতির আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়।

কাঙাল হরিনাথ তৎকালীন মাসিক ২০ টাকা বেতনে চাকরি করলেও কৃষককূলের দুঃখ দুর্দশা দেখে থিতু হয়ে থাকতে পারেননি। কৃষক, দিনমজুর ও তাঁতিসহ নানা সম্প্রদায়ের মানুষের দুঃখ দুর্দশার কথা ইংরেজ সরকারের নজরে আনার জন্য সাংবাদিকতার পেশা বেছে নেন। তিনি 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকার' মাধ্যমে একটি লেখক শ্রেণি সৃষ্টি করেন। এ লেখকদের অধিকাংশ হরিনাথ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। হরিনাথের জীবন-দর্শনে স্বজাতি প্রেম ও স্বদেশপ্রীতির গভীর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী ছিলেন। ইংরেজ কর্তৃক প্রণীত আইনের তীব্র সমালোচনা করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন ভারতবাসীকে শৃঙ্খলিত করবে। তাই তিনি ভারতবাসীর দুরবস্থার কথা চিন্তা করে বলেন, 'ভারতের কপাল মন্দ, অস্ত্রাইনে হস্ত বন্ধ' যা চিরস্মরণীয় বাণী হিসেবে বাংলা সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। গ্রামবাসীর সংবাদ, ফ্যাশন, বিজ্ঞাপন, নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনি, গোমস্তা ও জমিদারদের প্রজা পীড়নের সংবাদ 'গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা'য় গুরুত্বসহকারে ছাপা হয়। কাঙাল হরিনাথের সংবাদপত্র প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল নীলকর, স্থানীয় প্রশাসন, গোমস্তা ও জমিদার কর্তৃক প্রজা পীড়নের সংবাদ সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং

অত্যাচারীদের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করা। সে জন্য এ সংবাদপত্রটি সমকালে অনেক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

কাঙাল হরিনাথ জীবনের শেষ দশকে আধ্যাত্মিক দর্শনে বিশ্বাস করতেন। তিনি 'ফিকিরচাঁদ ফকীরের গীতাবলী' গঠন করেন। তাঁর রচিত গানে বাউলসম্রাট ফকির লালন সাঁইজির প্রভাব রয়েছে বলে গবেষকরা মনে করেন। তিনি অসংখ্য গানের গীতিকার ও সুরকার। তাঁর ব্যাকুল সুর ও ধ্বনি আজও শ্রোতাদের বিমোহিত করে। তিনি বলেন, "হরি, দিন তো গেল সন্ধ্যা হ'ল, পার কর আমারে। তুমি পারের কর্ত্তা, শুনে বার্তা, ডাকছি হে তোমারে।।"

সর্বোপরি, কাঙাল হরিনাথের অগ্রসর চিন্তা ও দর্শন আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির পথিকৃত হিসেবে যুগ যুগ ধরে অম্লান থাকবে।

তথ্যসূত্রঃ

Aman, Amanur (2016), The Enlightened Soul In Search of Kangal Legacz, Eti Prokashon, 2nd edition, Dhaka.

Hunter, W W (1973), A Statistic Account of Bengal.Vol II (Nadia & Jessore), D K Publishing House, New Delhi.

Rangpur; Historz within easz grasp, The dailz star, 14 Januarz 2020.

The India Gazette, 22.11.1831 and The Calcutta Monthlz Journal, November,1831.

মজুমদার, সতীশচন্দ্র (১৩০৮ বঙ্গাব্দ), কাঙাল হরিনাথের জীবনী (সংক্ষিপ্ত কথা), হরিনাথ গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, কলকাতা।

মজুমদার, অশোক (২০১২), "কুষ্টিয়া জেলার সাংবাদিকতার অগ্রজ কাঙাল হরিনাথ মজুমদার", বনমালী ভৌমিক (সম্পা.), কুষ্টিয়ার স্মরণীয়-বরণীয় যাঁরা, আর এস এস প্রিন্টার্স, ঢাকা।

রাব্বি, ফজলে (২০০২), ছাপাখানার ইতিকথা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শেখর, সৌমিত্র (২০০৪), বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, অগ্নি পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

চক্রবর্তী, রতন লাল ও অন্যান্য (সম্পা,) (২০০১), রঙ্গপুর বার্তাবহ, প্রগেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা ও

আলী, মোহাম্মদ আহাদুজ্জামান, 'আলো জ্বলছে যেভাবে', দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, ১৪ এপ্রিল ২০০১।

সমরপাল (১৯৯৫), বৃটিশ ভারতে সংবাদপত্র দলন, দেবীপাল, নাটোর।

মামুন, মুনতাসীর (১৯৮৫), ঊনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র (প্রথম খণ্ড), অনন্যা প্রকাশনী, ঢাকা।

সেন, জলধর (১৩২০ বঙ্গাব্দ), কাঙাল হরিনাথ, প্যারাগন প্রেস, ক্যালকানা।

রাব্বি, ফজলে (২০০২), ছাপাখানার ইতিকথা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ (১৩৫৪বঙ্গাব্দ), হরিনাথ মজুমদার। সাহিত্য সাধক চরিতমালা-৩৫, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা।

চৌধুরী, আবুল আহসান (সম্পাদনা)। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার স্মারকগ্রন্থ। ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ।

রায়, দীনেন্দ্রকুমার, কাঙাল হরিনাথ, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩ ব. কলকাতা।

ঘোষ, বিনয় (১৩২০বঙ্গাব্দ), সাময়িকপত্রে সমাজচিত্র। পঞ্চম খন্ড। বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি। কলকাতা।

ঘোষ, বারিদবরণ, (সম্পাদনা)। জলধর সেনঃ আত্মজীবনী ও স্মৃতিতর্পণ। কলকাতা, জিঙ্গাসা, ১৯৯১।

বিশ্বাস, নন্দ গোপাল (সম্পাদনা)। কাঙাল হরিনাথ স্মরণে ১৬১তম জন্মবার্ষিকী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া, ১৪০১ বঙ্গাব্দ।

চৌধুরী, আবুল আহসান (সম্পাদনা), কাঙাল-ফিকিরচাঁদ ফকীরের গীতাবলী, পাঠক সমাবেশ, ২০১৬।

বিশ্বাস, নন্দ গোপাল (সম্পাদিত)। কাঙাল হরিনাথ স্মরণে ১৬১তম জন্মবার্ষিকী ১৪০১ সাল। কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

লেখক পরিচিতঃ **ওবায়দুল্লাহ**, এক্সপ্লোরেশন অফিসার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

ফিরে দেখা

বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক বাংলা চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ'

অনুপম হায়াৎ

সারাংশ : [বর্তমান বাংলাদেশে তথা সাবেক অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রথম সবাক পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ' (১৯৫৬)। ১৯৪৭-উত্তর পরিবেশে স্টুডিও-ল্যাবরেটরিবিহীন পরিবেশে অনভিজ্ঞ শিল্পী-কুশলীদের নিয়ে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে এবং অন্যান্য অসুবিধার মধ্যে নাট্যকর্মী ও প্রকৌশলী আব্দুল জব্বার খান এই চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন, চলচ্চিত্রটির শুটিং হয় ঢাকায় আর প্রিন্টিং হয় লাহোরের শাহনূর স্টুডিওতে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সেই চলচ্চিত্র নির্মাণের এবং এর মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।]

মূল শব্দ : আব্দুল জব্বার খান, 'মুখ ও মুখোশ', ইকবাল ফিল্মস, চলচ্চিত্র, বাংলাদেশ, ডাকাত, ইনাম আহমদ, পূর্ণিমা।

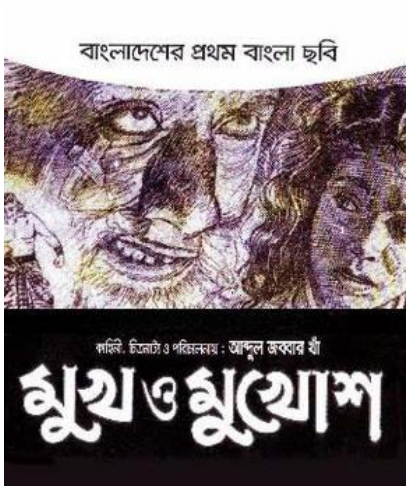

'মুখ ও মুখোশ' ছবির দৃশ্য

ভূমিকা : বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় ঢাকায় ক্রাউন থিয়েটারে ১৮৯৮ সালের ১৭ এপ্রিলে। আর বাঙালিদের মধ্যে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন হীরালাল সেন (১৮৬৮-১৯১৭) কলকাতায়। ১৯১৬-১৭ সাল থেকে কলকাতাই হয়ে ওঠে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রাণকেন্দ্র। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গ অঞ্চল হয়ে ওঠে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের বাজার। ১৯২৮-৩১ সালে পশ্চিমবঙ্গের অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে নওয়াব পরিবারের উদ্যোগে ঢাকায় 'সুকুমারী' ও 'দি লাস্ট কিস' নামে দুটো নির্বাক চলচ্চিত্র তৈরি হয়। অবিভক্ত ভারতে কলকাতা চলচ্চিত্র নির্মাণের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় পূর্ববঙ্গের ফতেহ লোহানী, বনানী চৌধুরী, ইসমাইল মোহাম্মদ, কাজী খালেক ও হিমাদ্রী চৌধুরী (ওবায়েদ উল হক) ওখানেই চলচ্চিত্রে জড়িত হন।

পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের পর স্টুডিও-ল্যাবরেটরিবিহীন ও শিল্পী-কুশলীবহীন পরিবেশে তরুণ নাট্যকর্মী আব্দুল জব্বার খান (১৯১৫-১৯৯৩) 'মুখ ও মুখোশ' (১৯৫৬) নামে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেন। সেই অর্থে 'মুখ ও মুখোশ' হচ্ছে আজকের বাংলাদেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র। পেশায় প্রকৌশলী হয়েও তিনি ছিলেন নেশায় নাট্যকর্মী ও নাট্যকার। নিজের লেখা নাটক 'ডাকাত' অবলম্বনে তিনি এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন। 'পূর্ববঙ্গের আবহাওয়া চলচ্চিত্র নির্মাণের উপযোগী নয়' অবাঙালি চিত্রপ্রদর্শক-পরিবেশকের এমন উক্তির প্রতিবাদে আব্দুল জব্বার খান 'মুখ ও মুখোশ' নির্মাণ করেন। এই চিত্রের শুটিং হয় ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে আর প্রিন্টিং ও প্রসেসিং করা হয় লাহোরের শাহনূর স্টুডিওতে। মঞ্চ ও বেতার শিল্পী এবং নতুন কলাকুশীলবদের নিয়ে তিনি এই চলচ্চিত্র তৈরি করেন। একটি পুরোনো ক্যামেরা দিয়ে চিত্রগ্রহণ এবং টেপ রেকর্ডার দিয়ে শব্দ ধারণ করা হয়। চলচ্চিত্রটির মহরত উদ্বোধন করেন গভর্নর ইস্কান্দার মির্জা ১৯৫৪ সালের ৬ আগস্টে এবং গভর্নর শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক চলচ্চিত্রটির মুক্তির দিন ১৯৫৬ সালের ৩ আগস্ট ঢাকার 'রূপমহল' সিনেমা হলে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

'মুখ ও মুখোশ' নির্মাণের জন্য আব্দুল জব্বার খান কয়েকজনকে নিয়ে গঠন করেছিলেন প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান 'ইকবাল ফিল্মস লি.'। তিনি পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এসবের মধ্যে রয়েছে: 'জোয়ার এলো' (১৯৬২), 'নাচঘর' (১৯৬৩), 'বাঁশরী (১৯৬৮) ও 'খেলাঘর' (১৯৭৩)। ১৯৬৪ সালে তিনি ঢাকার অদূরে পাগলা এলাকায় 'পপুলার ফিল্মস অ্যান্ড থিয়েটার' নামে

ফিল্ম স্টুডিও স্থাপন করেন। তিনি পাকিস্তান চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতিরও একজন নেতা ছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে তিনি সপরিবারে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের চলচ্চিত্র বিভাগের প্রধানও ছিলেন আব্দুল জব্বার খান।

প্রবন্ধের বিষয়, পরিধি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য : এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আবর্তিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রথম সবাক পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ' (১৯৫৬) নিয়ে। প্রবন্ধের ধরন হচ্ছে চলচ্চিত্র সংস্কৃতিকেন্দ্রিক ইতিহাসধর্মী, গুণগত ও মূল্যায়নমূলক। এটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে 'মুখ ও মুখোশ' চলচ্চিত্র নির্মাণের পটভূমি সম্পর্কে অবহিত করা এবং এর নানামুখী মূল্যায়ন করা।

তথ্য ও নিদর্শন সংগ্রহ পদ্ধতি এবং উৎস সূত্র : প্রবন্ধের বিভিন্ন তথ্য ও নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে সংশ্লিষ্ট পরিচালক, শিল্পী ও কুশলীদের সাক্ষাৎকার, ইতিপূর্বে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ, সংকলন, স্মরণিকা, পত্রপত্রিকা, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, বাংলাদেশ চিত্রপরিচালক সমিতি, চলচ্চিত্র সংসদ, বিভিন্ন পাঠাগার ও সূত্র থেকে। প্রতিটি তথ্য ও নিদর্শন সংগ্রহের সূত্র বিধি মোতাবেক উল্লেখ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা : ১৯৪৭-উত্তর পরিবেশে পূর্ব বাংলা (পূর্ব পাকিস্তান) তথা বর্তমান বাংলাদেশে ইকবাল ফিল্মস লিমিটেড-এর প্রযোজনায় আব্দুল জব্বার খানের পরিচালনায় প্রতিকূল পরিবেশে 'মুখ ও মুখোশ' নির্মাণের সমকালীন আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অনুধাবনের জন্য বদরুদ্দীন উমর রচিত 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' (১৯৭০), শেখ মুজিবুর রহমান রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' (২০১২) ও 'কারাগারের রোজনামচা' (২০১৭), আলমগীর কবির রচিত 'সিনেমা ইন পাকিস্তান' (১৯৬৯), ও ফিল্ম ইন বাংলাদেশ' (১৯৭৬), ফরিদউদ্দীন নীরদ রচিত 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র' (১৯৭৩), চিন্ময় মুৎসুদ্দী রচিত 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সামাজিক অঙ্গীকার' (১৯৮৭), শরাফুল ইসলাম রচিত 'মুখ ও মুখোশ'-এর 'ছেঁড়া পাতা' (১৯৯০) এবং ড. সৈকত আসগর রচিত 'আব্দুল জব্বার খান' (২০০২) প্রভৃতি গ্রন্থ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রকাশনা বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

প্রবন্ধ রচনা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক কাঠামো : চলচ্চিত্রে মানুষের জীবন, কর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটে থাকে বলে চলচ্চিত্রের অধ্যয়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

সমাজ বিজ্ঞান শাখার অন্তর্ভুক্ত। তাই 'মুখ ও মুখোশ' চলচ্চিত্র পাঠের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ও গুণগত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা হয়েছে। ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে অবিভক্ত বাংলার ১৮৯৬ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানদের অবদান, ১৯৪৭-এর দেশভাগ, রাজনীতি, সাতচল্লিশ-উত্তর ভাষা আন্দোলন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। আধেয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ফরাসি লেখক-গবেষক জেরার্ড জেনেট (১৯৩০-২০১৮)-এর আখ্যান তত্ত্ব বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এ ছাড়া, চলচ্চিত্রের নির্মাণশৈলী, কারিগরি ও শৈল্পিক দিক বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দৃশ্যরূপ, শব্দ ও সংগীত, সম্পাদনা ও অন্যান্য উপাদানের ব্যবহার সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে।

বীক্ষণে-অনুভবে 'মুখ মুখোশ' : 'মুখ ও মুখোশ' চলচ্চিত্রটির বিশ্লেষণে ফরাসি লেখক তাত্ত্বিক জেরার্ড জেনেটের (১৯৩০) আখ্যান বিদ্যার সহায়তা নেওয়া হয়েছে। এতে রয়েছে কাহিনির সংক্ষিপ্ত ধারণা, অন্তর্নিহিত বক্তব্য, দৃশ্যমাত্রা, শব্দমাত্রা, সম্পাদনামাত্রা ও তাৎপর্যময়তায় চলচ্চিত্রটির আঙ্গিক পর্যবেক্ষণ। এ ছাড়াও রয়েছে ঘটনার ধারাক্রম, চলচ্চিত্রের ভাষা ও প্রয়োগ কৌশল, পরিবেশ-প্রতিবেশ, চরিত্র অভিনয় বিশ্লেষণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাংস্কৃতিক উপাদান বিশ্লেষণ।

'মুখ ও মুখোশ' ছবির দুইটি দৃশ্য

'মুখ ও মুখোশ'-এর কাহিনি : আব্দুল জব্বার খান পরিচালিত 'মুখ ও মুখোশ' চলচ্চিত্রের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে তাঁর লেখা 'ডাকাত' নাটক অবলম্বনে। কাহিনিতে রয়েছে নানা অপরাধমূলক ঘটনা। এতে আছে শমসের ডাকাত ও দলবলের নানা ডাকাতি ও নারী অপহরণ, রহমান মৃধার এক পুত্র আফজালের ডাকাতের আস্তানায় বড় হওয়া, অন্য পুত্র জালালের দারোগা হয়ে অসততা ও দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়া, ডাকাত কর্তৃক অপহৃত কুলসুমের প্রেম, ডাকাতদের কবল থেকে রহমান মৃধার মেয়ে রশিদার উদ্ধার পাওয়া এবং জালালের স্ত্রী হামিদা কর্তৃক শ্বশুর-শাশুড়ি ও ননদের প্রতি অমানবিক আচরণের ঘটনা। কাহিনির অন্তিমে শমসের ডাকাতের মৃত্যু ও জালাল দারোগার জেল হয়। রহমান মৃধার সংসার আবার সুখের নীড় হয়ে ওঠে। পরিচালক ও প্রযোজক আব্দুল জব্বার খানের কাহিনি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নতুনত্বের কোনো পরিচয় নেই। দৈনিক ইত্তেফাকে লেখা হয় 'ছবির কাহিনি গতানুগতিক' (৯ আগস্ট ১৯৫৬)। বিশ্ব চলচ্চিত্র ইতোমধ্যেই নানা দিক দিয়ে এগিয়ে গেছে। জার্মানিতে প্রকাশবাদ, দাঙ্গাবাদ, ফ্রান্সের পরাবাস্তবতাবাদ, রাশিয়াতে সমাজবাদ ও ইতালিতে নব্য বাস্তবতাবাদের উত্থান ঘটেছে। এমনকি ভারতের কলকাতায়ও সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালী' নির্মাণ করে বিশ্বে সাড়া ফেলেছেন। 'পথের পাঁচালী' কাহিনি ও নির্মাণশৈলীর জন্য মানবিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। 'মুখ ও মুখোশ'-এর কাহিনি সম্পর্কে 'মাসিক সিনেমা' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়:

"কাহিনির দেশ পূর্ব বাংলায় এমন একটি কাহিনির চিত্ররূপের জন্য কোনমতেই প্রশংসা পেতে পারেন না প্রযোজকরা।'... ডাকাত দলের ডাকাতির স্থান, কাল, পাত্র, বিভিন্ন অঞ্চল দেখিয়ে বোধ হয় বোঝানোর চেষ্টা চলছিল যে, এদের অত্যাচারে সারাদেশ জর্জরিত।" (আগস্ট, ১৯৫৬)

ছবির অপরাধমূলক কাহিনি যদি রূপকার্থে ধরা হয় তা হলে বোধ হয় যথার্থ হয়। সাতচল্লিশ-উত্তর পাকিস্তানে বাঙালিদের রাজনৈতিক অধিকার, ভাষা ও সংস্কৃতি পাকিস্তানি দস্যুদের দ্বারা লণ্ঠিত হয়েছে রূপকার্থে শমসের ডাকাত ও তাঁর বাহিনীর মাধ্যমে।

বক্তব্য: ১৯৪৭-উত্তর নতুন পাকিস্তান নানা অপরাধ, ডাকাতি, নারী নির্যাতন, ঘুষ ও দুর্নীতিতে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। 'মুখ ও মুখোশ' চিত্রে তারই প্রতিফলন ঘটেছে বিভিন্ন ঘটনার রূপায়ণে। এতে একদিকে যেমন রয়েছে শমসের ডাকাতের বিভিন্ন ডাকাতি ও নারী অপহরণ, মদ্যপানসহ নাচের আসর, ছদ্মবেশ ধারণ,

রহমান মৃধার পারিবারিক জীবনে বিপর্যয়, সৎমার নিষ্ঠুরতা, জালালের ও কারাগারে অপরাধীদের সাথে সখ্য, ঘুষ গ্রহণ এবং অন্যদিকে রয়েছে বিচারে জালাল দারোগার জেল হওয়া। একসময় শমসের ডাকাতও নিহত হয়। কাহিনির সারমর্ম হয়েছে অপরাধীর শাস্তি এবং সত্য ও ন্যায়ের জয়।

দৃশ্যমাত্রা : চলচ্চিত্রের প্রাণ হচ্ছে শট ও সিকোয়েন্স। ক্যামেরায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুত্ব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দৃশ্য গ্রহণ করা হয। পরে দৃশ্যগুলো দৃশ্য-পরম্পরায় জোড়া দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র তৈরি করা হয়। সাথে থাকে প্রয়োজনীয় শব্দ অনুষঙ্গ।

একটি পুরোনো ক্যামেরার সাহায্যে 'মুখ ও মুখোশ'-এর দৃশ্য গ্রহণ করা হয়। গৃহীত দৃশ্যের মধ্যে দেখা যায় জঙ্গল, গাছ-পালা, নদী-নালা, নৌকা, মাঠ, আকাশ, মেঘমালা, গ্রামীণ বাজার, চায়ের স্টল, পুকুর, মেলা, মাঠে মারামারি ও গরু এবং সেই সাথে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর কার্যক্রম। ছবির পুরোটাই প্রায় গ্রামবাংলাকেন্দ্রিক। নবীন ক্যামেরাম্যান কিউ. এম. জামান তাঁর যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী পরিচালকের কল্পনা ও নির্দেশনা মোতাবেক দৃশ্য ধারণ করেছেন। ওই সময় প্রকাশিত দৈনিক 'আজাদ' (১০ আগস্ট ১৯৫৬) ছবির দৃশ্যায়নে ক্যামেরার নৈপুণ্যের কথা উল্লেখ করেছে। 'মুখ ও মুখোশ'-এর উল্লেখযোগ্য সম্পদ হলো এর অপার দৃশ্যসম্ভার। নদীমাতৃক একটি সোনার দেশ, এর মাঠ-ঘাট, বন, দিঘির পাড়, পায়ে চলা ছোট রাস্তা, বাঁশঝাড় সবই যেন ক্যামেরার ভাষায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নদীর ঘাট হতে পানিভরা কলসি কাঁখে বধূর সলজ্জ চাউনি আর ভীরু পায়ে চলা, উধাও নদীবক্ষে নৌকার সারি আর অসীমের মেঘ আর নদীর ঢেউয়ের মিতালির মধ্যে পূর্ব বাংলার রূপ হয়ে ফুটে উঠেছে। 'মুখ ও মুখোশ' এদিক হতে যেকোনো মহলে পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব ছবি ও এর বিচিত্র রূপায়নের সার্থক প্রতিচ্ছবি বলে পেশ করা যেতে পারে।'

'দৈনিক ইত্তেফাক' (৯ আগস্ট ১৯৫৬) পত্রিকায়ও এ ছবির দৃশ্যায়নের প্রশংসা করা হয়। পরদিন 'পাকিস্তান অবজারভার' (১০ আগস্ট ১৯৫৬) পত্রিকায়ও এ ছবির আলোকচিত্রের প্রশংসা করা হয়।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্য : (১) ছবির শুরুতেই রয়েছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ইকবাল ফিল্মস লিমিটেডের চিত্রলিপি 'আমাদের কথা'। সাথে বাঁশি ও দোতরার সুর। পরবর্তী দৃশ্যে রয়েছে জঙ্গলের পথ দিয়ে চলন্ত ঘোড়ার গাড়ি ও তার শব্দ।

হঠাৎ ডাকাতদের আক্রমণ। এরই মধ্যে দেখা যায় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বহমান ছোট নদীতে একটি খোলা নৌকার মধ্যে শায়িত একজন কিশোরকে নিয়ে যাচ্ছে একজন লোক। লোকটি বলছে: 'আমার কোনো দোষ নাই'। বাঁশির সুর। এরপর দেখা যায় লোকটি কোদাল দিয়ে মাটিতে গর্ত খুঁড়ছে লাশ কবর দেয়ার জন্য আর বলছে : 'আমি হুকুমের চাকর। আমারে মাফ কইরা দাও।' এমন সময় ডাকাত দলের আক্রমণ। তারা দেখে যে কিশোরটি বড় হয় ডাকাতের আস্তানায়। নাম তার আফজাল।

(২) বিশ বছর পরে ঘটনার দৃশ্যে দেখা যায় জঙ্গলে নাচের দৃশ্য। চারদিকে ডাকাতরা বসে মদ্য পান করছে, হাসছে ও ঢলাঢলি করছে। ডাকাত সর্দার কী যেন দেখছে। ইন্টারকাটে দেখা যায় জঙ্গলের এক পাশে আফজাল একাকী বসে বসে কী যেন ভাবছে। কুলসুম তার কাছে এসে বসে। সে আফজালকে 'ছোট সর্দার' বলে ডাকে। এদিকে ঘোষণা শোনা যায়, শমসের ডাকাতকে ধরিয়ে দেওয়া হলে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। সর্দার অন্যান্য ডাকাতকে বলে, কুলসুমের ওপর নজর রাখার জন্য। তারা জানায়, কুলসুম ছোট সর্দার আফজালের প্রেমে পড়েছে।

(৩) ছবির আর একটি দৃশ্যে রয়েছে আফজাল ও কুলসুমের একসাথে বসে থাকা। কুলসুম তার অতীত জীবনের কথা বলে, কীভাবে সে বিয়ের রাতে ডাকাত দল কর্তৃক অপহৃত হয়েছিল। তারা জঙ্গলের পাশে মাঠে বসে কথা বলে, তাদের পেছনে ওপরে আকাশে ভাসমান মেঘের মেলা।

(৪) ছবির ইনডোর দৃশ্যে মফস্বল এলাকার দারোগা জালালের অফিস ও বাড়ি। অফিস কক্ষে জিন্নাহ, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের ছবি। দারোগার পরনে পুলিশি পোশাক। কিন্তু অফিসের পিয়ন কুদাই খালি গায়ে চা দেয়। একজন পুলিশকে উর্দু ভাষায় কথা বলতে দেখা যায়। জালাল একজনকে এজাহার নেওয়ার কথা বলে। পরবর্তী দৃশ্যে দেখা যায় ছদ্মবেশে শমসের ডাকাতের সাথে জালাল দারোগার সাক্ষাৎ, গোপন সলাপরামর্শ, ঘুষের টাকা গ্রহণ এবং মুখে মুখে ন্যায়নীতির উচ্চারণ। ছবির এই সিকোয়েন্সটি বাস্তবসম্মত এবং নীতিহীন পুলিশের ভ্রষ্টতার চিরাচরিত লক্ষণ।

(৫) ছবির আরেকটি বাস্তবসম্মত দৃশ্য হচ্ছে, পুকুরে স্নানরত রশিদার কণ্ঠে গান 'মনের বনে লাগলো দোলা' গাওয়া। এই দৃশ্যে গানের সাথে পুকুরে শাপলা ফুল

এবং শাপলা পাতার মৃদু কম্পন, পানিতে মৃদু ঢেউ খুবই আকর্ষণীয়। এই দৃশ্যে ছদ্মবেশী শমসের ডাকাতের লোভ, কুদৃষ্টি ও সংলাপ সাদৃশ্যপূর্ণ।

(৬) ছবিতে বেশ কটি ডাকাতি ও নারী অপহরণের দৃশ্যও রয়েছে। এগুলোর হোতা শমসের ডাকাত। একসময় আফজাল ও কুলসুমের নেতৃত্বে শমসের ডাকাত নিহত হয়। জালাল দারোগার অপকর্ম ফাঁস হয়। সে জেলে যায়।

(৭) ছবির একটি দৃশ্যে চায়ের স্টল, লোকজন এবং ভারতের হিন্দি ছবি 'আওয়ারা'র পোস্টার দেখা যায়। দৃশ্যটি চমৎকার।

(৮) ছবির শেষ পর্যায়ে একটি সিকোয়েন্সে দেখা যায় রহমান মৃধা গরুর সাথে কথা বলছে। দৃশ্যটি বড়ই চমৎকার এবং প্রতীকী অর্থপূর্ণ। জালালের আক্ষেপ- 'আমি অন্যায় করেছি।'

শব্দমাত্রা : গ্রামভিত্তিক অপরাধমূলক চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ'-এর প্রধান সম্পদ হতে পারত শব্দ। কিন্তু প্রযুক্তিগত সুবিধার অভাবে শব্দহীন মুভি ক্যামেরা ও টেপ রেকর্ডারে ধারণকৃত ত্রুটিপূর্ণ শব্দের কারণে ছবিতে বেশিরভাগ অংশেই শব্দমাত্রা ব্যঞ্জনা পায়নি। কিন্তু তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে শব্দ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

'মুখ ও মুখোশ'-এ শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে– সংলাপ, গান, বাঁশি, দোতারা ও গিটারের বাজনা, আবহসঙ্গীত, পারিপার্শ্বিক শব্দ, গাড়ির শব্দ, ঘোড়ার গাড়ির শব্দ, হট্টগোল, মারামারি ও জনরব ইত্যাদি। প্রথমত 'মুখ ও মুখোশ' বাংলা ভাষায় নির্মিত চলচ্চিত্র। তাই এই চলচ্চিত্রের পাত্র-পাত্রীদের মুখে উচ্চারিত বাংলা শব্দ পাকিস্তান-উত্তর পরিবেশে বায়ান্নর রক্তাক্ত ভাষা আন্দোলনের পর নতুন করে ব্যঞ্জনা পেয়েছে। তৎকালীন পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মাতৃভাষা 'বাংলা' উচ্চারণে শব্দ ও সঙ্গীতের মাধুর্য্য নতুন করে দ্যোতনা পেয়েছে এই চলচ্চিত্রের পর্দায়। তবে কারিগরি ত্রুটির কারণে কোনো কোনো সংলাপ শোনা যায়নি। অন্যদিকে হামিদার (জহরত আরা) কণ্ঠস্বর হয়ে গেছে পুরুষালি। নায়িকা কুলসুমের (পূর্ণিমা সেন) উচ্চারণও ত্রুটিপূর্ণ। শমসের ডাকাতের (ইনাম আহমেদ) সংলাপ ও অট্টহাসির শব্দ যথাযথ।

ছবির আবহসঙ্গীত বাঁশি ও দোতারার সুরে বাংলাদেশের চিরচেনা পরিবেশকে যথার্থতা দিয়েছে। তবে কোনো কোনো গ্রামবাংলার দৃশ্যে গিটারে হিন্দি গানের সুর ব্যবহার করা ঠিক হয়নি।

'মুখ ও মুখোশ'-এর প্রধান সম্পদ দুটি গান। একটি গান মাঝির কণ্ঠে পল্লী গীতি 'আমি ভিন গেরামের নাইয়া' (আব্দুল আলীম) গ্রাম, নদী, নৌকা, পাল, পানি ও মানুষ ইত্যাকার সব মিলিয়ে বাংলার চিরচেনা পরিবেশকে তুলে ধরেছে। ছবির অন্য গান রশিদার কণ্ঠে পুকুরে স্নানরত অবস্থায় 'মনের বনে লাগলো দোলা' (মাহবুবা হাসনাত) কথা, সুর, গায়কি ঢং ও পরিবেশ অনুযায়ী যথার্থ হয়েছে। ছবির আরেকটি চমৎকার শব্দময় দৃশ্য হচ্ছে রহমান মৃধার (বিনয় বিশ্বাস) গরুর সাথে একা একা কথা বলা।

সম্পাদনা মাত্রা : যেকোনো চলচ্চিত্রের প্রাণ হলো সম্পাদনা। বিভিন্ন সময়ে ক্যামেরায় ধারণকৃত শট জোড়া দিয়ে সাথে শব্দ সংযোগ করে একটি সার্থক চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। 'মুখ ও মুখোশ'-এর শুটিং করা হয়েছিল ঢাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে এবং টেপ রেকর্ডারে ধারণ করা হয়েছিল শব্দ। এসব দৃশ্য ও শব্দ সম্পাদনা করা হয়েছিল লাহোরের শাহনূর স্টুডিওতে। ছবির যতটুকু সাফল্য ও যথার্থতা তা সম্পাদকের টেবিলেই তৈরি হয়েছে। সম্পাদনার কারণেই চলচ্চিত্রের দৃশ্যময়তা, শব্দ ও সংগীত ব্যঞ্জনা পেয়েছে।

অভিনয়: 'মুখ ও মুখোশ' চলচ্চিত্রে শিশু থেকে প্রবীণ পর্যন্ত অনেক চরিত্র রয়েছে। এদের মধ্যে পড়ে পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, কাজের মেয়ে, দারোগা, সেপাই, চাকর, প্রেমিকা, ডাকাত, ডাকাতের সহযোগী, চায়ের দোকানদার, চায়ের দোকানদারের লোকজন, মাজারের ফকির, গ্রামের যুবকগণ, নৌকার মাঝি, গ্রামবাসী, কারারক্ষী ও নৃত্যশিল্পী প্রমুখ। এসব চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁরা প্রায় সবাই ঢাকার মঞ্চ ও বেতারের শিল্পী অথবা একেবারে নবীণ। এদের একজন কুলসুম (প্রেমিকা) চরিত্রে রূপদানকারী পূর্ণিমা সেন ছিলেন চট্টগ্রামের মঞ্চশিল্পী। বোন রশিদা চরিত্রে রূপদানকারী (নাজমা বেগম পিয়ারী) ও দারোগার স্ত্রী হামিদা চরিত্রে রূপদানকারী (জহরত আরা) ছিলেন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং বেতারশিল্পী।

'মুখ ও মুখোশ' চলচ্চিত্রের পাত্র-পাত্রীর প্রায় সবাই মঞ্চ ও বেতারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। চলচ্চিত্রে তাঁদের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র শমসের ডাকাত হিসেবে ইনাম আহমেদ যথার্থ অভিনয় করেছেন। রহমান মৃধার চরিত্রে বিনয় বিশ্বাসও পরিবারের পিতা হিসেবে ভালো অভিনয় করেছেন। আফজাল চরিত্রে পরিচালক আব্দুল জব্বার খান নিজেই অভিনয় করেছেন। ডাকাত দলের ছোট সর্দার এবং কুলসুমের (পূর্ণিমা সেন) প্রেমিক হিসেবে ও

জালাল দারোগার (আলী মনসুর) বড় ভাই হিসেবে তিনি মোটামুটি ভালো অভিনয় করেছেন। ছবির একটি নৃত্যদৃশ্যে গওহর জামিল ও তাঁর সহশিল্পীও ভালো অভিনয় করেছেন। পিতা রহমান মৃধার চরিত্রে বিনয় বিশ্বাসের অভিনয় ইতালীয় নব্য-বাস্তবতার স্বাক্ষর বহন করে। চাকর গদাই হিসেবে সাইফুদ্দীন ও তার প্রেমিকা জামিলা হিসেবে বিলকিস বারীর অভিনয়ও ভালো হয়েছে। জালাল দারোগা হিসেবে আলী মনসুরও সুঅভিনয় করেছেন। বিশেষ করে ঘুষ গ্রহণ ও ডাকাতের সাথে গোপনে সাক্ষাৎ এবং জেলখানায় বড় ভাই আফজালের সাথে সাক্ষাৎপর্বে।

নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে জালাল দারোগার স্ত্রী হামিদার চরিত্রে জহরত আরার কণ্ঠস্বর পুরুষালি শোনালেও শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদের সাথে তার দুর্ব্যবহার দর্শক হৃদয়ে দাগ কাটে। রশিদা চরিত্রে নাজমা বেগম পিয়ারী বেশ প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। আর কুলসুম চরিত্রে পূর্ণিমা সেনও যথার্থ অভিনয় করেছেন। লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, সব নারীর পরনেই রয়েছে বাংলার চিরপরিচিত নারীর পোশাক শাড়ি।

উপসংহার : 'মুখ ও মুখোশ' (১৯৫৬) বাংলাদেশের তথা অবিভক্ত সাবেক পাকিস্তানের প্রথম সবাক বাংলা পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। ১৯৪৭-উত্তর পরিবেশে ঢাকায় যখন নতুন করে সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছিল, তখন প্রতিকূল পরিবেশে এই চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর চিত্র ব্যবসায়ীদের অসহযোগিতা এবং স্টুডিও-ল্যাবহীন পরিবেশে নতুন পাত্র-পাত্রীদের নিয়ে আব্দুল জব্বার খান 'মুখ ও মুখোশ' নির্মাণ করে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সেই সাথে জন্ম হয়েছিল বাংলা জাতীয়তাবাদী চলচ্চিত্রেরও। 'মুখ ও মুখোশ' নামটিও প্রতীকী। এই চলচ্চিত্রে ডাকাত ও পুলিশের মুখ ও মুখোশ উন্মোচিত হয়। উর্দু, হিন্দি ও অন্যান্য ভাষার চলচ্চিত্রের ভিড়ে 'মুখ ও মুখোশ' ছিল একেবারেই খাঁটি বাংলা ভাষার নদীমাতৃক গাছপালাশোভিত এবং দোতারা-বাঁশির সুরস্নাত বাংলাদেশের আবহে নির্মিত চলচ্চিত্র। 'মুখ ও মুখোশ' বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে গৌরবময় সোনালি অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত।

পরিশিষ্ট :

'মুখ ও মুখোশ'-এর পরিচয় লিপি
কাহিনি, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা
প্রযোজনা
চিত্রগ্রহণ
সংগীত পরিচালনা
শব্দগ্রহণ
সম্পাদনা
রূপসজ্জা
গান রচনা
কণ্ঠদান
নৃত্য পরিচালনা
রেখাঙ্কন
পরিবেশনা
অভিনয়

মুক্তি : আব্দুল জব্বার খান
: ইকবাল ফিল্মস লি.
: কিউ. এম. জামান
: সমর দাশ
: মঈনুল ইসলাম
: এম. এ. লতীফ
: শমসের আলী
: আব্দুল গফুর (সারথী)
: আব্দুল আলীম ও মাহবুবা হাসনাৎ
: গওহর জামিল
: মোস্তফা আজিজ
: পাকিস্তান ফিল্মস সার্ভিস ও পাকিস্তান ফিল্মস ট্রোস্ট
: পূর্ণিমা, নাজমা, জহরত আরা, ফায়জা, বিলকিস, খালেদা, জব্বার খান, আলী মনসুর, বিনয় বিশ্বাস, এফ করীম, সাইফুদ্দিন, আমিন, আতাউর, নূরুল আনাম, রফিক, সোনা মিয়া, খায়রুজ্জামান, মাস্টার জুলু, আলমগীর ও অন্যান্য।
: ৩ আগস্ট, ১৯৫৬।

সহায়ক তথ্যপঞ্জি

১। হায়াৎ, অনুপম (১৯৮৭), মুখ ও মুখোশ, একটি ইতিহাসের জন্ম, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস, এফডিসি, ঢাকা।
২। ইসলাম, শরাফুল (১৯৯০), মুখ ও মুখোশের ছেঁড়াপাতা, নাগরিক প্রকাশনালয়, ঢাকা।
৩। হায়াৎ, অনুপম (২০২০), ইকবাল ফিল্মস লি.-এর প্রথম সবাক বাংলা কাহিনিচিত্র 'মুখ ও মুখোশ', কবীর, মো. নিজামুল সম্পাদিত বাংলাদেশ আর্কাইভ জার্নাল, সংখ্যা ১৬, জুন, ঢাকা।
৪। খান, আব্দুল জব্বার (১৯৮৬ ও ১৯৮৭) আমার কথা, তারকালোক (পাক্ষিক) ঢাকা, ১৫-৩১ ডিসেম্বর ও ১-১৪ জানুয়ারি
(খ) আব্দুল জব্বার খানের সাক্ষাৎকার, কমলাপুর, মায়াকানন, ঢাকা, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩।
৫। আসগর, সৈকত (২০০২), আব্দুল জব্বার খান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

লেখক পরিচিত: **অনুপম হায়াৎ**, লেখক, গবেষক, চলচ্চিত্র শিক্ষক ও সমালোচক।

মমতাজউদদীন আহমদের নাট্যসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন

মোরশেদুল আলম

*[**সারসংক্ষেপ :** যুদ্ধক্ষত সময়ের রক্তাক্ত অনুভূতিপুঞ্জের সামগ্রিক অঙ্গীকার সত্ত্বেও যা জীবন্ময়; শত ব্যর্থতা, আত্মত্যাগ ও রক্তরঞ্জিত স্মৃতিযন্ত্রণার মধ্যেও যা এক অন্তর্লীন আশাবাদে সম্মুখসঞ্চারী– সেই অনিঃশেষ বৈচিত্র্যে গতিশীল চেতনার শিল্পপ্রয়াসের মধ্যেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক নাট্যসাহিত্যের গৌরবময় স্বাতন্ত্র্য। বাংলা সাহিত্যের ধারায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাশ্রয়ী নাটকগুলো এক নান্দনিক দলিলরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের অনেক আলোকিত-অনালোকিত ও অনিবার্য অনুষঙ্গ উৎকীর্ণ হয়েছে এসব নাটকে। বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের সমগ্র চেতনাকে বাংলা নাট্যসাহিত্যে শিল্পময় করে তুলেছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে নাট্যকার মমতাজউদ্‌দীন আহমদ (১৯৩৫-২০১৯)-এর নাম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে স্ব-চিহ্নিত। বলা যেতে পারে, জাতীয় চৈতন্যের খণ্ড খণ্ড শিল্পরূপায়ণের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের এক অখণ্ড চেতনাকেই নির্মাণ করেছেন তিনি নাটকের পর নাটকে মূলত। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে বাঙালি জাতিসত্তার মর্মবেদনা, হাহাকার, অবরুদ্ধ সময়ের যন্ত্রণাদগ্ধ ছবি একদিকে যেমন তিনি এঁকেছেন অসাধারণ শৈল্পিক নৈপুণ্যে, অন্যদিকে তেমনি তুলে ধরেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম বীরত্বগাথা, আশ্চর্য দুঃসাহস ও নিখাদ দেশপ্রেম। তাঁর নাট্যমালায় একদিকে যেমন বিধৃত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধকালে সময়ে নিরীহ বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি হানাদার দস্যু ও তাদের এদেশীয় দোসরদের পৈশাচিক বর্বরতা ও নির্মমতার বিবরণ; তেমনি অন্যদিকে তাঁর নাটকের পরতে পরতে উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালীন সদ্য-স্বাধীন দেশে স্বপ্নভঙ্গের মনোবেদনা, নিদারুণ হতাশা, আত্মগ্লানি, অবক্ষয়, পতন, পচন ও বিনষ্টি এবং মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিসংগ্রামের উজ্জ্বল চেতনা অবমাননার সকরুণ চিত্রও। সন্দেহ নেই, মুক্তিযুদ্ধের অন্তর-বাহির আর বহুমাত্রিক প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গের শৈল্পিক রূপায়ণে মমতাজউদ্দীন আহমদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাশ্রয়ী নাটকসমূহ নিঃসন্দেহে প্রাচুর্যের সাক্ষ্যবাহী। বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধ তাঁর নাট্যসাহিত্যে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে, তার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য এবং রূপ ও রূপান্তর অঙ্কনই এই বর্তমান গবেষণা-প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।]*

***মূলশব্দ :** বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ, নাট্যসাহিত্য, মমতাজউদ্দীন আহমদ, অভিজ্ঞান, অবলোকনশক্তি, স্ব-চিহ্নিত, শিল্পীচৈতন্য, গৌরবগাঁথা।*

ভূমিকা : নাট্যসাহিত্যে জীবন বর্ণনীয় নয়, দর্শনীয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীর কর্মাচরণ এবং সংলাপভাষ্যে নাটকীয় ঘটনা-উপঘটনা গতিশীল হয়, পরিণতি লাভ করে দ্বান্দ্বিক চৈতন্যে। নাটকের এই বিশিষ্ট শিল্পরূপের জন্য একজন নাট্যকারকে বস্তুগত ভাবদৃষ্টিতে জগৎ-সংসারের নির্লিপ্ত প্রতিরূপ নির্মাণ করতে হয়। নাট্যকার নাটক সৃষ্টি করেন বটে, কিন্তু নাটকীয় ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে একীভূত হন না; বরং এক সর্ব-নিরপেক্ষ নৈর্ব্যক্তিক চেতনায় তিনি নাটকীয় বিষয় ও চরিত্রকে গতিময়তা দান করে কাহিনিকে করে তোলেন পরিণামমুখী; এবং স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর সৃষ্টজগৎকে। নাটকের এই অসাধারণ শিল্পবৈভব নির্মাণের[১] লক্ষ্যে, চেতনার মর্মমূলে আস্থা রেখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এবং মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যাঙ্গনে দীপ্র আবির্ভাব ঘটে বেশ কিছু-সংখ্যক প্রবীণ ও নবীন নাট্যকারের। মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী চেতনায় উজ্জীবিত এইসব নাট্যকার, বিশেষত তরুণ নাট্যকারদের পদচারণে মুখরিত হয়ে ওঠে একাত্তর-পরবর্তী বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভূমিতল। মূলত, একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনা এবং মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্য অভিন্ন সত্তায় গ্রথিত। বলাবাহুল্য, বাংলাদেশের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র বাঙালি জাতিসত্তাকে পুনর্জাত করেছে নবতর চিন্তা-চেতনায়। তাই সঙ্গতকারণেই কবিতা-ছোটগল্প-উপন্যাস অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের অপরাপর শাখার মতো নাটকেও ঘটেছে এর দীপ্তিময় প্রতিফলন। এ-প্রসঙ্গে সমালোচক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> *স্বাধীনতাচেতনা বাংলাদেশের নাট্যকারদের পুনর্জাত করেছে নতুন মূল্যবোধে। স্বাধীনতা-উত্তর সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে আমাদের নাট্যকাররা শাণিত হাতে বেছে নিলেন নাট্য-আয়ুধ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কলকাতার গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ যেমন এক্ষেত্রে প্রেরণা সঞ্চার করেছে, তেমনি অনুপ্রেরণা এসেছে মুক্তিযুদ্ধের অম্লান সব সদর্থক চেতনা থেকে। ফলে স্বাধীনতা-উত্তরকালে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের চেতনাকে মর্মমূলে লালন করে আমাদের নাট্যসাহিত্যের অঙ্গনও হয়েছে নতুন নতুন ভাবনা ও মূল্যবোধে পরিস্রুত ও সমৃদ্ধ, নাটকের বিষয় ও আঙ্গিকে সঞ্চারিত হয়েছে নতুন নতুন মাত্রা।*[২]

তবে এখানে স্মরণীয়– মুক্তিযুদ্ধের সময়ে, কি অব্যবহিত পরে যেসব নাটক রচিত হয়েছে তাতে প্রাধান্য পেয়েছে মনন নয়, আবেগ। একাত্তরের পর প্রচুর নাটক লিখিত ও মঞ্চস্থ হলেও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অধিকাংশ নাট্যকর্মই শিল্পসফল নয়। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য:

> উনসত্তরের বিদ্রোহ, একাত্তরের যুদ্ধ এবং স্বাধীনতার পর জোয়ারের মতো বাঁধভাঙা স্রোত এসেছিলো। কারো চাওয়া-পাওয়ার ওপর বড় বেশি নির্ভর না করে প্রচুর নাট্যকর্ম হয়েছে। যুদ্ধ-সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বাদ ছিলো, পলাতক শত্রুকে আঘাত করার আনন্দ ছিলো। এইভাবে আমাদের হাতে বৃষ্টির ধারার মতো নাটক ঝরে পড়েছে। সব নাটক হয়নি, কয়েকটি হয়েছে।[৩]

তাৎক্ষণিক প্রয়োজন বোধে, প্রগল্‌ভ সংলাপে ও আবেগে, সর্বোপরি পথ-নাটকের আঙ্গিকে লিখিত এইসব নাটকের সাহিত্যিক মূল্য ততটা না থাকলেও একথা অনস্বীকার্য যে, মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিলরূপে এই নাটকগুলোর নাম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্যের ইতিহাসে লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে।

মূল আলোচনা : সুদীর্ঘ নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ এবং বাঙালির অপরিমেয় আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ বাঙালি জাতির জীবনে এক মহত্তম প্রাপ্তি। বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধ যেমন সমগ্র বাঙালিকে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্ব-মানচিত্রে করেছে সুপ্রতিষ্ঠিত, তেমনি প্রভাবিত করেছে বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিকেও। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় প্রেরণা আর প্রদৃপ্ত চেতনা যেমন আমাদের সাহিত্যিকদের সৃজনশীল চৈতন্যে, মন ও মননে নিঃসন্দেহে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে স্বাধীনতা-উত্তরকালে, তেমনি তাঁদের মেধা, অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞান ও প্রত্যাশা এবং স্বপ্নের দিগন্তকেও করেছে সুবিস্তৃত। আমাদের নাট্যকারদের অনেকেই বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, আবার কেউ-বা পরোক্ষভাবে। দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাক-হানাদার বাহিনীর নির্বিচারে পীড়ন-নির্যাতন ও গণহত্যার মধ্যে বাঙালির সশস্ত্র প্রতিরোধ ও যুদ্ধ বাঙালি নাট্যকারদের অনুপ্রেরণার উৎস। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য অনুধাবনযোগ্য :

> *গণহত্যার মুখে ও মুক্তিযুদ্ধের আগুনের মধ্যে লেখকরা দুইটি প্রধান ক্ষেত্রে ছিটকে পড়েছিলেন : এক, কিছু সংখ্যক যাঁরা আত্মরক্ষার্থে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং দুই, যাঁরা দেশের ভিতরে থেকে গেলেন শহরে বা জনপদের ভিতরে। প্রথম দল মুক্তিযুদ্ধের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত সংগঠন। তাঁরা সভা-সমিতি করেছেন, লিখেছেন, ভ্রমণ করেছেন।...*
>
> *অপরপক্ষে যাঁরা দেশের ভিতরে ছিলেন তাঁরাই অভিজ্ঞতার সত্যিকারের ভাণ্ডারী, কারণ তাঁরা যেখানেই থাকুন, শহরে কিংবা গ্রামে, এ-সমস্ত আলোড়নের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন ঝটিকা-উত্তাল নদীর ভিতরে যেমন মাছ। তাঁরা শত্রুপক্ষের অপারেশন দেখেছেন, গণহত্যা দেখেছেন, মৃত্যুর মুখোমুখি প্রতি মুহূর্তে তাঁরা বেঁচে থেকেছেন। তাঁরা দেখেছেন ঘৃণা, দুর্জয় প্রতিরোধ; দেশের জন্য, আদর্শের জন্য, মানবতার জন্য আত্মত্যাগের অপার মহিমা। অস্তিত্বের এই বিচিত্র অবস্থা ও সমতলে-অতলে ওঠা-নামা মহত্তম অভিজ্ঞতার চরিত্রসম্পন্ন।[৪]*

তবে তুলনাসূত্রে উল্লেখ্য, কবিতা-উপন্যাস-ছোটগল্প কিংবা সাহিত্যের অন্যান্য শাখা অপেক্ষা নাট্যসাহিত্যের সুবিস্তৃত শিল্প-অবয়বেই আমাদের নাট্যকাররা মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্য শিল্পরূপ নির্মাণে বেশি মাত্রায় সমর্থ হয়েছেন। নাট্যসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপকতা ও বৈশিষ্ট্য এবং বহুমাত্রিক প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ শিল্পিত মাধুর্যে তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের বরেণ্য ও কৃতী নাট্যকাররা। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত নাট্যসাহিত্য সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে প্রচুর হলেও অধিকাংশ নাটকেই নাট্যকারের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞান এবং জীবনবোধের রাসায়নিক সংশ্লেষের পরিচয় তেমন নেই। এই নাট্যসমূহে মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিশিখার তেমন প্রজ্বলন নেই এবং সর্বোপরি নাট্যকারের একান্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের স্বাক্ষরও অনুপস্থিত। বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন ঘটেছে বিভিন্নভাবে– কখনো সরাসরি মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে নাটক রচিত হয়েছে, আবার কখনো-বা মুক্তিযুদ্ধের অম্লান চেতনায় পরিস্নাত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে নাটকের বিষয়াংশ। কোনো কোনো নাটকে বাঙালি জাতির অকুতোভয় দুর্বার সংগ্রামের বহুবর্ণিল প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ নির্মাণ করেছে নাটকীয় পটভূমি; আবার কতিপয় নাট্যকারের নাটকে একদিকে লক্ষ করা যায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষীয়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এবং অন্যদিকে স্বাধীনতা-বিরোধীদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও ধিক্কার। এ ছাড়াও, বাংলাদেশের মহান মুক্তিসংগ্রামে বাঙালিদের আত্মত্যাগের মহিমা, স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম

বীরত্বের শিল্পগাথা বিনির্মাণ করেছে কোনো কোনো নাটকের বিষয়বস্তু ও শৈল্পিক-কাঠামো। তবে এখানে স্মরণীয়– মুক্তিযুদ্ধের সময়ে, কি অব্যবহিত পরে যেসব নাটক রচিত হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশতেই প্রাধান্য পেয়েছে নাট্যকারের অভিজ্ঞান-পরিশোধিত মনন নয়, আবেগ।

তুলনাসূত্রে উল্লেখ্য, একাত্তরের পর প্রচুর নাটক লিখিত ও মঞ্চস্থ হলেও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অধিকাংশ নাট্যকর্মই শিল্পসফল নয়। যুগের দাবিতে রচিত প্রচার-সর্বস্ব এসব নাটকে যুদ্ধের সংবাদ আছে, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক নারীধর্ষণের চিত্র আছে, আছে করতালি-ধ্বনিত জনপ্রিয় বক্তৃতার মেলা, আছে বিপুল আবেগের উদ্দাম প্লাবন; কিন্তু যা নেই, তা হলো শৈল্পিক পরিমিতিবোধ ও স্রষ্টার নিরাসক্ত জীবনচেতনা।[৫] তবে এ কথাও সত্য যে, উপর্যুক্ত নাটকগুলোর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধোত্তরকালে বেশ কিছু যুগোত্তীর্ণ নাটকও রচিত হয়েছে। বাংলাদেশের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী চেতনায় সঞ্জীবিত একঝাঁক প্রবীণ ও নবীন নাট্যকারের হাতে মুক্তিযুদ্ধের অন্তর-বাহিরের প্রকৃত সত্যস্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে এসব নাটকে অসামান্য দৃপ্ততায় ও প্রকাশ নৈপুণ্যে; এবং একই সঙ্গে উল্লেখ্য, এইসব সমকাল-সচেতন, অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানঋদ্ধ এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সংবেদনশীল নাট্যকারের ইতিবাচক জীবনচেতনা ও সমাজ অবলোকনশক্তির গভীরতা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এই নাটকগুলোকে অনবদ্য ও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত শিল্পকর্মে পরিণত করেছে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এই নাট্যকর্মগুলো আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক বর্ধিষ্ণু উজ্জ্বল শাখারূপে। মুক্তিযুদ্ধের অন্তর-বাহির আর বাঙালি জাতির অকুতোভয় দুর্বার সংগ্রামের বহুবর্ণিল অনুষঙ্গ স্বাধীনতা-উত্তরকালে যেসব নাট্যকারের শিল্পীচৈতন্য নির্মাণ করেছে, তাঁদের মধ্যে যাঁর নাম স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখযোগ্য, স্বকীয়তায় দীপ্তোজ্জ্বল যাঁর নাট্যভুবন– তিনি মমতাজউদ্দীন আহমদ (১৯৩৫-২০১৯)। তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাট্যমালায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে মানবতার অপরাজেয় গৌরবগাথা।

দুই.

একজন যথার্থ সমাজসচেতন ও কাল-সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিক-নাট্যকার তাঁর পারিপার্শ্বিকতা থেকে কখনোই দূরে সরে থাকতে পারেন না। এই অনিবার্যসূত্রেই **১৯৭১** সালের মুক্তিযুদ্ধ অন্যান্য নাট্যকারের মতো মমতাজউদ্দীন আহমদের সংবেদনশীল চেতনা-জগৎকেও করেছে আন্দোলিত, আলোড়িত। রক্তাক্ত,

সংক্ষুব্ধ অথচ মরণজয়ী জীবনাবেগে মুক্তিযুদ্ধকালীন রক্তিম সময়ের বহুমাত্রিক অনুভবপুঞ্জকে তিনি রূপায়িত করেছেন তাঁর নাট্যসাহিত্যে। **১৯৫২** খ্রিষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলন, **১৯৬৫** খ্রিষ্টাব্দের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ, **১৯৬৬** খ্রিষ্টাব্দের ছয় দফা, **১৯৬৯** খ্রিষ্টাব্দের গণ-অভ্যুত্থান, পাকিস্তানি স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের পতন ও জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণ, **১৯৭০** খ্রিষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচন ও বিপুল ভোটে জয়লাভকারী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা-প্রদানে ইয়াহিয়ার অস্বীকৃতি এবং **১৯৭১** খ্রিষ্টাব্দের রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রাম ও পৃথিবীর মানচিত্রে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের গৌরবময় আসন লাভ– এই বহুবর্ণিল দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ, জটিল ও রক্তাক্ত সময়পুঞ্জ নির্মাণ করেছে মমতাজউদ্দীন আহমদের নাট্যমানস। এ- প্রসঙ্গে নাট্যকারের ভাষ্য :

> *স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের হাতিয়ার ছিল নাটক। খোলা মাঠের উদোম মঞ্চে স্বাধীনতার জন্য নাটক। মঞ্চের তিন দেয়াল, আলোর ঝকমকানি, অভিনয়ের সুধা তখন বাঞ্ছিত ছিল না, নাটককে সরাসরি মাঠে নামতে হয়েছে ফাল্গুনের খোলা বাতাসের মতো, গ্রীষ্মের নিকটবর্তী সূর্যের মতো। ছলাকলা দিয়ে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস এবং বৈশাখের খরতাপকে তো সম্মোহিত করা যায় না।*[৬]

তাই সঙ্গত কারণেই বলা যেতে পারে, মমতাজউদ্দীন আহমদ মূলত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অগ্নিকুণ্ডে বসেই রচনা করেছেন তাঁর নাটকসমূহ; এবং এ পর্যায়ে স্মরণীয় তাঁর চারটি নাট্যকর্ম– *'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা'* (১৯৭১), *'এবারের সংগ্রাম'* (১৯৭১), *'স্বাধীনতার সংগ্রাম'* (১৯৭১) এবং *'বর্ণচোরা'* (১৯৭২)।

'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা' নাটকটি লেডি গ্রেগরির *'Rising of the Moon'* নাটিকা অবলম্বনে রচিত। রূপান্তরের নির্বিচার স্বাধীনতা নিয়ে নাট্যকার মমতাজউদ্দীন আহমদ এই নাটককে বাঙালির স্বাধীনতাস্পৃহায় সংস্থাপন করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের গণজোয়ার যখন তুঙ্গে, ঠিক সেই সময় এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয় বলে তা স্বাধীনতাকামী জনমানসে স্বাধীনতার সপক্ষে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। *'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা'* নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র মোয়াজ্জেম হোসেন একজন বিপ্লবী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের অকুতোভয় সৈনিক। তাকে ধরার জন্য পাকিস্তানি শাসক হুলিয়া জারি করে। কারণ মোয়াজ্জেমের অপরাধ– সে নির্যাতিত, শোষিত, ভীরু ও আপনভুবনে নিদ্রিত বাঙালি জাতিকে জাগ্রত করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে এবং পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রকে দু'ভাগ করে পূর্ব পাকিস্তানকে 'বাংলাদেশ' নামে এক স্বতন্ত্র, স্বাধীন

রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দেশবাসীকে একত্র করে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। মুক্তিসংগ্রামী মোয়াজ্জেমকে ধরার জন্য পাকিস্তানি সরকার এক দেশপ্রেমিক ও সৎ পুলিশ অফিসার নূর মোহাম্মদকে দায়িত্ব প্রদান করে ঘোষণা করে যে, মোয়াজ্জেমকে ধরে দিতে পারলে নগদ দুই হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু একদিন কৃষ্ণপক্ষ রাতে এক অতি সাধারণ গরীবুল্লাহর ছদ্মবেশধারী মোয়াজ্জেমকে হাতের নাগালে পেয়েও তার চোখে-মুখে দেশমাতৃকার স্বাধীনতার প্রত্যয়, দেশকে শত্রুমুক্ত করার দৃঢ়সংকল্প এবং তার তেজোদীপ্ত, প্রখর ব্যক্তিত্বের কাছে শেষ পর্যন্ত হার মেনে যায় নূর মোহাম্মদ দারোগার কর্তব্যবোধ :

লোক ॥ মালিক, আপনার মতন দুঃখী মানুষ খুব কম দেখেছি।

নূর ॥ তুমি খুব রসের কথা বলতে পার গরীবুল্লাহ। কিন্তু পাবলিকের ধারণা পুলিশের চাকরি খুব সুখের চাকরি। আমার পাঁচটা ছেলেমেয়ে। একটাও লায়েক হয়নি। বড় মেয়েটার বিয়ের বয়স হয়েছে, বিয়ে দিতে কমসে কম দু-তিন হাজার টাকা খরচ হবে।... দু' হাজার টাকা পুরস্কার। কম কি! আজ যদি লোকটাকে ধরতে পারি, প্রমোশন হবেই। এক ধাক্কাতে ইন্সপেক্টর। শেষ বয়সে একটু শান্তি পাব। কোন দিন তো ভস্ করে মরে যাব। আমার কাছে ওসব দেশপ্রেম, দেশের মনি বলে পার পাবে না সে। চাচা আপন জান বাঁচা। শুনলাম তুমি দেশের মানুষের জন্য কাজ করছ, কর। আমি আমার কাজ করছি। তোমার মতো দেশপ্রেম করলে আমার ছেলেমেয়ে না খেয়ে মরবে।[৭]

কিন্তু শেষপর্যন্ত জীবন ও জীবিকার ঝুঁকি নিয়ে তিনি মোয়াজ্জেম হোসেনকে পরাধীন জন্মভূমির স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনার জন্য পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন :

নূর ॥ খুব সাবধান। আপনার চারদিকে দুশমন। পদে পদে বিপদ।
লোক ॥ ঘরে ঘরে আমাদের বন্ধু।
নূর ॥ আবার কখন দেখা হবে?
লোক ॥ একদিন সকালে, যখন আকাশজুড়ে প্রকাণ্ড লাল সূর্য উঠবে। অথবা এক রাত্রিতে, যখন আকাশভরে পূর্ণ চাঁদ হাসবে।
[দু'জনে আন্তরিক উষ্ণতায় করমর্দন করল]
নূর ॥ আসুন।

লোক ॥ হামার নাম ফকির গরীবুল্লাহ।
নূর ॥ আপনি বিপ্লবী মোয়াজ্জেম হোসেন, স্বাধীনতার সৈনিক।[৮]

ছদ্মবেশী মুক্তিসংগ্রামী মোয়াজ্জেম হোসেনের সংলাপে মূর্ত হয়ে উঠেছে পাকিস্তানি শাসকের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ, পরাধীন দেশ ও জাতির মুক্তির জন্য তার আকুলতা ও উৎকণ্ঠা এবং সম্ভাব্য স্বাধীনতাযুদ্ধের জন্য তার সহৃদয় প্রার্থনা :

লোক ॥ হামাদের মগজের মধ্যে দিনরাত কিসব আলতু-ফালতু ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে হামাদের শক্তি কেড়ে নিচ্ছে, হামাদের সাহসকে গোর দিচ্ছে। আর এই সুযোগে যতসব জালেম আল্লার নাম ভাঙিয়ে হামাদের শরীল থেকে শোঁ শোঁ করে রক্ত শুষে লিয়ে বিদেশে পাচার করছে মালিক। আপনারা এসব রুখতে পারেন না কেন?

নূর ॥ তুমি শালা একটা উজবুক। বিড়াল হয়ে বাঘের মুখে থাপ্পড় দিতে চাও।

লোক ॥... হামাদের এই ভাঙা ফুটা শরীল লিয়ে তামাম মানুষ যদি এক জায়গাতে হাজির হতে পারতাম, একবার যদি জালেমের লোভের কব্জিতে দাঁত বসাতে পারতাম, রক্তের নেশাতে গর্জাতে পারতাম, তখন বুঝা যেত কারা বিলাই আর কারা বাঘ। যুদ্ধই তো হয়না মালিক, মরণ-বাঁচনের লড়াই। হামরা এই নদীর দেশের মানুষ একটা যুদ্ধ চাই মালিক, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ।[৯]

নূর হোসেন ব্রিটিশ আমলের ছাত্র। ইংরেজ তাড়ানোর আন্দোলনে সংগ্রাম করেছেন তিনিও। তিনি সবকিছুই বোঝেন, কিন্তু কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা তাঁর হাত-পা। তবে নাটকের পরিণামী অংশে বিপ্লবী চেতনার সঞ্জীবনী সুধায় মোয়াজ্জেমের দেশপ্রেমের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে তিনিও হয়ে ওঠেন বিদ্রোহী :

নূর ॥ যদ্দিন বাঁচব, দেশের জন্য কাঁদব। দেশকে ভালোবাসা তো পাপ নয়। যারা স্বাধীনতা, তোমার আমার স্বাধীনতার জন্য কাজ করছে, তাদেরকে আমিও ভালোবাসি গরীবুল্লাহ।... আমি নিজেই বড় সাহেবের কাছে হাজির হব মিঞা। বড় সাহেবকে বলব, জ্বি হ্যাঁ, আমি নূর মোহাম্মদ ছোট দারোগা, বিপ্লবী মোয়াজ্জেম হোসেনকে ছেড়ে দিয়েছি। আর আমার সিপাহী দলিলুর রহমানকে গুলি করেছি। আর কী বলব? আমি শালা আবার কে যে আমাকে

এত কথা বলতে হবে? ঐ যে চাঁদটা জানে আমার আর কোনো কথা বলার দরকার নাই। ডিউটি ইজ ডিউটি।[১০]

তিন.

এবারের সংগ্রাম নাটকে রূপকের ব্যঞ্জনায় নাট্যকার মমতাজউদ্দীন আহমদ একদিকে যেমন তুলে ধরেছেন বাঙালির ওপর পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির অমানবিক নির্যাতনের কাহিনি; অন্যদিকে তেমনি রূপায়িত করেছেন পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী বাঙালির রুখে দাঁড়ানোর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মালিকানা নিয়ে জেনারেল টিক্কা খানের বাংলাদেশে আগমন এবং সমগ্র বাঙালি জনতার চোখে-মুখে স্বাধীনতা ও বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, দৃপ্ত প্রত্যয় আর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণা ও আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করে পরিশেষে রাতের আঁধারে টিক্কা খানের বিস্ফোরণ-উন্মুখ বাংলাদেশ থেকে নিঃশব্দে পলায়ন *এবারের সংগ্রাম* নাটকে অত্যন্ত চমকপ্রদভাবে চিত্রিত হয়েছে। তবে সরাসরি নয়, কয়েকটি প্রতীকী চরিত্রের মধ্য দিয়ে (যেমন : ইয়াহিয়া খানরূপী বাদশাহ্, জুলফিকার আলী ভুট্টোরূপী উজীর, টিক্কা খানরূপী সিপাহসালার প্রমুখ) নাট্যকার মমতাজউদদীন ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের অসহযোগ আন্দোলনের রক্তাক্ত সময় ও ঘটনাপুঞ্জ উপস্থাপন করেছেন এ-নাটকে।

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক– সর্বক্ষেত্রেই বিমাতাসুলভ আচরণ ও বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করে আসছিল। এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে দ্রুত উন্নতি সাধিত হলেও পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ক্রমাগত পশ্চাৎ-মুখী হতে থাকে। *এবারের সংগ্রাম* নাটকে সেই সত্যস্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে জুলফিকার আলী ভুট্টোরূপী উজীর এবং ইয়াহিয়া খানরূপী বাদশাহ্‌র সংলাপভাষ্যে :

১. *উজীর ॥ আমাদের এক একটা উদভূট্টি গাঁও গেরাম রাজধানী বানাবার নাম করে আমরা রাতারাতি আজদাহা শহর আর বন্দর বানিয়ে তুলছি, আমরা শুধু এখানে মিল-কারখানা গড়ছি।... ধন-দৌলত, তেজারত-বাণিজ্য, রাজধানী, সৈন্য, সিপাহী সব তো আমাদের এখানে। আমরা হলাম বাদশাহ্, আমরা মালিক। ঐসব গরিব, ন্যাংটা বদবুওয়ালা*

প্রজাদের কাছে গেলে দুনিয়ার আর বাদশাহ্‌রা আমার মুখে লানৎ দিবে, থুথু ছিটাবে।[১১]

২. *বাদশাহ্ ॥ তুমি আমার আন্ধার ঘরের চেরাগে রৌশন, যাও আমার পূর্বরাজ্যের মালিক। আজীজ দোস্ত আমার। এক্ষুনি এলান করে দিচ্ছি। তুমি আমার প্রতিনিধি। আমার দোস্ত-দুশমন সবাই তোমাকে কুর্ণিশ করবে। তুমি যা কিছু আদেশ করবে, পূর্বরাজ্যের তামাম জীবকে সেই আদেশ বিনা ওজরে মানতে হবে। যদি না মানে, তাহলে তোমার যখন যাকে ইচ্ছে, যেমন করে ইচ্ছে জবেহ করে দাও, চাবুক লাগাও।*[১২]

টিক্কা খানরূপী সিপাহসালারের সঙ্গে পূর্ববাংলার শোষিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের কথোপকথনে উঠে এসেছে বাঙালি জাতির সংগ্রামী জীবনের অভীপ্সা, বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত :

সিপাহ ॥ নিকাল যাও।

মানুষ ॥ তাড়িয়ে দিচ্ছ? ওগো দেশের মানুষ, দ্যাখ দ্যাখ আমারই দেশ থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। বাহ্ রে শক্তিমান বীরপুরুষ। কিন্তু আর তো আমাকে তাড়াতে পারবে না। আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এখন তো সময় হয়েছে মুখোমুখি মোকাবিলার।

সিপাহ ॥ তোমাকে আমি খুন করব।

মানুষ ॥ এই তো আমি চাই। কর, খুন কর। আমি মরব, আমার ভাই মরবে, বোন জীবন দিবে। আর আমাদের দামাল ছেলেরা লড়াই করবে। আমাদের এক এক ফোঁটা রক্তে একশোটা বিদ্রোহী ছেলে জন্ম নিবে, ওরা লড়বে। আজীবন লড়াই চলবে। বিচারপতি, বলোতো, বলো– দেশের জন্য, জাতির জন্য যুদ্ধ শুরু হলে জিতবে কারা? আমার রক্ত ঢেলে দেওয়া ছেলেরা, না ঐ রক্তখোরের দল?

[সিপাহসালার পলায়ন করছে। সিপাহসালার অবশেষে পালিয়ে গেল]...

মানুষ ॥ পালিয়ে যাবে কোথায়? এদেশের কোনো ঘরে তার আশ্রয় জুটবে না। মাইল কে মাইল মানুষের মিছিল নিয়ে এদেশের সবখানে ওর তল্লাশী

চালাব। খুঁজে বের করবই জুলুমবাজকে। আমার ছেলের রক্তের দাম আমি কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নিব। ভাইসব, সূর্যের আগুনে শরীরকে তাতিয়ে নাও। এস, ঘর ছেড়ে বাইরে এস, এস শ্যামল ঘাসের দেশে।

[অজস্র কণ্ঠে গান : দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে]

এবারের সংগ্রাম–

ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠ ॥ স্বাধীনতার সংগ্রাম।[১৩]

এবারের সংগ্রাম নাটকটিতে 'মানুষ' চরিত্রটি প্রতীকী ব্যঞ্জনায় হয়ে উঠেছে পরাধীন ও অবরুদ্ধ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর :

মানুষ ॥ আমার ছেলের কাঁচা রক্তে যে দেশ ভেসে যাচ্ছে, সেই রক্তের উপর জালেমের বুট রেখে তুমি মালিক হতে এসেছ? না। আমার হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে এ আকাশ, এ মাঠ আর সমুদ্রকে বলে দিচ্ছি : ভাইসব, এদের চিনে রাখ– এরা ধর্মের নামে, সংহতির নামে নানা ফন্দির জাল বিস্তার করে আমাদের শোষণ করছে। আর এদের ছেড়ে দিও না। এবার এরা ঘরে ঘরে ঢুকে প্রত্যেকের সন্তানকে হত্যা করবে। এরা খুনী, মানুষের রক্তের বিনিময়ে এরা সাম্রাজ্যবাদীদের ডেকে আনে। তোমরা এদের নির্মূল কর।[১৪]

স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা এবং *এবারের সংগ্রাম* নাটক দু'টি **১৯৭১** সালের মার্চ মাসের সেই অগ্নিগর্ভ উত্তাল দিনগুলোতে দেশের বহু শহর ও গ্রামাঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ ট্রাকের ওপর পরিবেশিত হয়ে স্বাধীনতাকামী পরাধীন বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করে, উদ্বোধিত করে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য অনুধাবনযোগ্য :

*স্বাধীনতা আন্দোলনের অব্যবহিত আগে, যথাক্রমে **১৪** ও **২১** মার্চ **১৯৭১**, মমতাজউদদীন আহমদ রচিত নাটক দু'টির শিল্পমূল্য যাই হোক না কেন, স্বাধীনতার চেতনাবাহী নাটকের পথিকৃৎ হিসেবে ঐতিহাসিক মূল্যের দাবী রাখে। এখানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বললে হয়তো তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। **১৯৭১** সালের মার্চ মাসে অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই নাটক দু'টি চট্টগ্রামের প্যারেড ময়দান ও লালদীঘি ময়দানে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশে অভিনীত হতে দেখেছিলাম। নাটক যে গণ-আন্দোলনকে কীভাবে সরাসরি উদদীপ্ত করতে পারে, তা আমার মতো অনেকেরই প্রথম ধারণা হয়েছিলো সেদিন।*[১৫]

চার.

পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে, চিরবঞ্চিত ও অবহেলিত বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে **১৯৭১** সালের গোড়ার দিকে বাংলার ছাত্র-শিক্ষক-কৃষক-শ্রমিক অর্থাৎ সর্বস্তরের জনগণের আন্দোলনে-বিক্ষোভে-মিছিলে ঢাকার রাজপথসহ সমগ্র বাংলাদেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে উত্তাল। এদেশের স্বাধীনতাকামী সকল বাঙালি জানত– প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে একটা ইতিবাচক সমাধানের লক্ষ্যে যতই রুদ্ধদ্বার বৈঠক করুক না কেন, এর ফলাফল হবে একেবারেই শূন্য। মূলত, বৈঠকের নামে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যেমন একদিকে সময়ক্ষেপণ করতে থাকে, তেমনি অন্যদিকে বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেবার জন্য এদেশের নানা অঞ্চলে সাধারণ নর-নারীর ওপর লেলিয়ে দেয় পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের পদলেহী সুসজ্জিত সেনাবাহিনী এবং পুলিশকে। এইসব বর্বর পাকিস্তানি হানাদাররা বাঙালির স্বাধীনতাসংগ্রামকে সমূলে উপড়ে ফেলবার জন্য নির্বিচারে শুরু করে নিপীড়ন, নির্যাতন, ধর্ষণ এবং গণহত্যা। পাকিস্তানি বর্গীওয়ালা, হুকমত খাঁ, ঝাড়ুদার ঝকড়ু এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সৈনিক জহুরুল হক, ফারুক, দুখু, গায়ক, বৃদ্ধ– এইসব বহুমাত্রিক চরিত্রের সমবায়ে নাট্যকার মমতাজউদদীন আহমদ তাঁর *স্বাধীনতার সংগ্রাম* নাটকে সেই ঐতিহাসিক সত্যস্বরূপকে উন্মোচিত করেছেন। পাকিস্তানি সিপাহি হুকমত খাঁ এবং ঝাড়ুদার ঝকড়ুর সংলাপে আমরা পেয়ে যাই পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর নির্বিচারে গণহত্যা, বর্বরতা আর নৃশংসতার মর্মস্পর্শী চিত্রমালা :

হুকমত ॥ ক'টা লাশ ট্রাকে উঠল?

ঝকড়ু ॥ গুনতে গুনতে ভুলে গেলাম। একশোটা হবে। আরও একশোটা পড়ে আছে।

হুকমত ॥ তো দু'শোটা। বারো ঘণ্টাতে মাত্র দু'শোটা দুশমনকে গুলী? হামার মুল্লুকের নওজোয়ানরা করছে কি! এত কম করে মারলে সাত কোটি দুশমন মারতে সাতশো সাল লেগে যাবে। পাখির বাচ্চার মতো ঠুস-ঠুস করে মারবি,

তবে তো! আজাদী লিবে? যা ঝকড়ু, বাকি লাশ ট্রাকে তুলে লাইনে চলে যা।

ঝকড়ু ॥ আমি পারব নাই সিপাহী জী।

হুকমত ॥ পারব নাই? ঝকড়ু–

ঝকড়ু ॥ হামার দিল ফেটে গেল। এই দ্যাখেন, মানুষের রক্তে হামার হাত দু'খান লালে লাল হয়ে গেল, হামার মাথা খারাপ হয়ে গেল।... দু'বোতল দারু টেনে লাশ তোলা কাজে নেমেছিনু মালিক। একটা লাশ, দশটা লাশ, এমনি করে নব্বইটা লাশ উঠিয়েছি। এক বাড়িতে ঢুকে দেখি, তিনটা লাশ রক্তের মধ্যে ভাসছে। বাপটাকে তুললাম, একটা জোয়ান বেটাকে তুললাম। ফের ঘরে ঢুকলাম, দেখলাম কি মায়ের সিনা ফাটিয়ে গুলী চলে গেছে। মা-জননী শুয়ে আছে, আর বাচ্চাটা মায়ের দুধে ঠোঁট দিয়ে লহুর মধ্যে পড়ে আছে। বাচ্চাটা তখনও ছটফট করছে। আমি পারলাম না, পালিয়ে এলাম। এমন লহু, এমন ছেলে, এমন মাকে গায়েব করতে পারব নাই মালিক, হামি পারব নাই। হামার দারুর নেশা কেটে গেল, মায়ের লহুতে লাল এ হাত দু'টা অবশ হয়ে গেল।[১৬]

মুক্তিযুদ্ধের সময়, বিশেষত ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে এবং ডিসেম্বরের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রখ্যাত অধ্যাপক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী ও রাজনীতিবিদসহ এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদেরকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর আলবদর-আলশামস-রাজাকাররা নির্মমভাবে হত্যা করে। বাংলাদেশের এই স্বর্ণসন্তানেরা ছিলেন সত্যের পূজারি, প্রগতির দিশারী, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধের অধিকারী। তাঁরা হৃদয়ে সতত লালন করতেন অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভ, একটা সংকল্প এবং সুন্দর ও কল্যাণময় মানবতার আদর্শে উজ্জীবিত এক সুন্দর সমাজের স্বপ্ন। একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ করার অব্যবহিত পরে বধ্যভূমিগুলোতে যখন দেশের সেরা সন্তান বুদ্ধিজীবীদের গলিত শবদেহ খুঁজে পাওয়া যায়, তখন পত্রিকায় তার বিবরণ পড়ে গোটা বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়ে পড়ে; শোকের আতিশয্যে বজ্রাহত হয়ে পড়ে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাদের বিজয়লগ্নে জাতির এই চরম সর্বনাশে। *স্বাধীনতার সংগ্রাম*

নাটকে বর্গী চরিত্রটির সংলাপে উন্মোচিত হয়েছে বুদ্ধিজীবী নিধনের এই সকরুণ, হৃদয়বিদারক ও মর্মদ্রাবী চিত্র :

বর্গী ॥ আমাদের পিয়ারা ওয়াতানকে ঝড়-ঝাপটা আর আবোল-তাবোল হৈ-হুল্লোড় থেকে বাঁচাবার জন্য জান খাতরা করে হুকমত খাঁ আর তার সাথীরা যা করছে, সব ঠিক করছে। না হলে এ পিয়ারা ওয়াতন পয়মাল হয়ে যাবে। ...তোমরা হলে বেকুব, আহাম্মক, হল্লা মাচানেওয়ালা। তোমাদের মুল্লুকের ভাই-বেরাদর জান দিল, তাতে কার কি হল? কারো কিছু হল না। বিশ্বাস কর, তোমাদের আহাম্মকী দেখে আমি দিনরাত চোখের আঁসু ফেলেছি।... তবে তোমরা কিছু ভেব না ভাই, তোমাদের আত্মীয়-স্বজনকে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দাফন করেছি। সুন্দর সাদা কাপড়ের কাফন দিয়ে আস্তে আস্তে তাজিমের সঙ্গে গোরের মধ্যে শুইয়ে দিয়েছি। সেই কাফনের কাপড় নিজের টাকা দিয়ে কিনে দিয়েছি, লোবান বাত্তি ভি কিনেছি।[১৭]

স্বাধীনতার সংগ্রাম নাটকটিতে পাকিস্তানি স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের বাঙালি জাতির বিদ্রোহ, সংগ্রাম আর প্রতিরোধের দুর্জয় চিত্র রূপায়িত হয়েছে দুখু-চরিত্রের সংলাপভাষ্যে :

দুখু ॥ তেইশ বছর সহ্য করেছি, ভালোবেসেছি, দয়া করেছি। কিন্তু তোমরা ভালো হবার নও। এখন প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে তোমাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেব। তোমাদের পালাবার পথ গুঁড়ো করে দেব আমরা সাড়ে সাত কোটি মানুষ। লজ্জায়, অপমানে আর পরাজয়ের যন্ত্রণায় তোমাদের সৈন্যবাহিনী পাগল হয়ে যাবে। এবার যুদ্ধ।

[গ্রেনেড ও গুলীর শব্দ]

এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।[১৮]

দুখুর সংলাপে যেমন একদিকে মূর্ত হয়ে উঠেছে তীব্র প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগ্রামের ইতিকথা, তেমনি অন্যদিকে বাংলার স্বাধীনতার তরুণ সৈনিক জহুরুল হকের সংলাপে বিদ্যুৎপ্রভার মতো ঝলসে উঠেছে স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষা :

জহুরুল ॥ আমার আঙুলের মধ্যে চারটা করে মোটা মোটা সুঁই গলগল করে ভরে দিয়েছে। দশ হাজার পাওয়ার লাইটের নিচে চোখ খুলে তিন দিন, তিন

রাত বসেছিলাম; দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গেছে। আমার বুকে আর পিঠে তোমার সিপাহীরা শঙ্খ মাছের চাবুক মেরেছে, তবু আমি বেঁচে আছি। আমি বেঁচে থাকব, বাংলার স্বাধীনতার জন্য বেঁচে থাকব।[১৯]

বলা বাহুল্য, বাংলার স্বাধীনতার জন্য এই সূর্যসম্ভব আকাঙ্ক্ষা জহুরুল হকের মতো বাংলার শত-সহস্র তরুণ-যুবা-বৃদ্ধ প্রদীপ্ত স্বপ্নের মতো হৃদয়ে লালন করতে পেরেছিল বলেই **১৯৭১** সালের **১৬** ডিসেম্বর, নয় মাসব্যাপী এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো স্থান করে নিতে পেরেছে।

পাঁচ.

স্বাধীনতা-উত্তরকালের অব্যবহিত পরে রচিত *বর্ণচোরা* মমতাজউদদীন আহমদের একটি অনবদ্য নাট্যকর্ম। এ-নাটক প্রসঙ্গে নাট্যকারের ভাষ্য :

যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি এবং স্বজন-প্রিয়জন হারিয়ে আমাদের মন তখন ভীষণ ক্লান্ত, স্বাধীনতা-বিরোধী শত্রুদের সম্পর্কে আমাদের অন্তরে তখন দারুণ ক্ষোভ। প্রতারকের চেহারা অসহ্য লাগত। সেই যন্ত্রণা, ক্রোধ এবং জ্বালা নিয়ে বর্ণচোরাকে চিহ্নিত এবং বর্ণালী নামের বাংলার রমণীয় যুদ্ধক্ষতকে উপলব্ধি করতে চেয়েছি। অপরাধ গোপন করার জন্য বর্ণচোরা প্রগল্‌ভ বলেই এ নাটকে বর্ণালী শব্দ নীরব। মঞ্চে যখন বর্ণচোরা এল, দর্শক তাকে ক্রোধ দিয়ে তিরস্কার করেছে। বাংলাদেশে ঢাকা বেতার থেকে প্রচারিত প্রথম নাটক 'বর্ণচোরা' শ্রবণ করে একজন চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিল, বর্ণচোরাকে মৃত্যুর শাস্তি দিয়েছেন, কিন্তু যারা বর্ণচোরাকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেয় তাদের জন্য আপনার নাটকের শেষ দৃশ্যে একই পরিণাম থাকবে তো? পত্রলেখকের সে চিঠির উত্তর এখনও রচনা করিনি।[২০]

বর্ণচোরা চার দৃশ্যের একটি নাটিকা। **২৫** মার্চ **১৯৭১** থেকে **১৬** ডিসেম্বর **১৯৭১** সাল পর্যন্ত এ-নাটকের সময়পট। এখানে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে খান গোলাম সাদেক খান নামের একজন দেশদ্রোহী রাজাকারকে কেন্দ্র করে, যে আপন স্বার্থের জন্য প্রয়োজন অনুসারে বারবার স্বীয়-চরিত্রের রং বদল করতে অতিশয় পারঙ্গম। এই গোলাম সাদেক খান এতটাই নির্মম ও পাষণ্ড যে, আত্মজের স্ত্রীকে পর্যন্ত সে নির্দ্বিধায় ও পৈশাচিক উল্লাসে সমর্পণ করে পাকিস্তানি ক্যাপ্টেনের হাতে; এমনকি

একুশে ফেব্রুয়ারি পুত্র ও পুত্রবধূর অনুপস্থিতিতে দুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে সে হত্যা করে তাদের সদ্যোজাত শিশু পলাশকে; কেননা পলাশ জন্মেছে শহীদ দিবসে। গোলাম সাদেকের বর্ণময় চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচন-প্রসঙ্গে এখানে সমালোচকের পর্যালোচনা স্মর্তব্য :

'বর্ণচোরা' নাটকে বাংলা, বাঙালি ও বাঙালি-সংস্কৃতি বিরোধী এক রাজাকারের পৌনঃপুনিক বর্ণান্তর দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে। শেরওয়ানী ও মুজিবকোটের প্রতীকী বর্ণের আড়ালে খান গোলাম সাদেক খানের সুবিধানুগ আশ্রয়। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধের সূচনালগ্নে খান গোলাম সাদেক খান মুক্তিসেনার সাথে হাত মিলিয়েছিলো, অর্থ সহযোগিতাও দিয়েছিলো তাদের। যুদ্ধারম্ভের অনতিকাল পরেই পাকিস্তানি সেনাদের বর্বরতায় মুগ্ধ, রবীন্দ্রসংগীত বিদ্বেষী গোলাম সাদেক খান আপন পুত্রবধূকে পাকিস্তানি সেনার কাছে নিজ হাতে তুলে দিয়ে 'আপন বংশে পবিত্র পাকিস্তানি রক্ত'ই কামনা করেনি, পাক-সেনাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নেমে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যার নীলনক্‌শা প্রণয়ন করার কাজেও রেখেছে সক্রিয় ভূমিকা।[২১]

পাকিস্তানের দোসর, দেশদ্রোহী রাজাকারের অঙ্গসংগঠন আলবদরের কর্মী বাতেন ইবনে খাইয়াম *বর্ণচোরা* নাটকের আর একটি ঘৃণ্য চরিত্র, যে **১৯৭১** সালের **১৪** ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবীসহ এদেশের স্বর্ণসন্তানদের বধ্যভূমিতে হত্যা করে অতি উৎসাহের সঙ্গে, নির্মম পাশবিকতায়। গোলাম সাদেক খান এবং বাতেনের সংলাপে উঠে এসেছে সেই কালো অধ্যায়ের হিংস্র বাস্তবতার মর্মন্তুদ চিত্রমালা :

বাতেন ॥ মেজর জেনারেলের হুকুম মতো আমরা দশটা গ্রুপে কাজ করেছি হুজুর। একটা কাফেরও ঘর ছেড়ে পালাতে পারেনি।

সাদেক ॥ আল্লাহতালা রাহমানুর রহীম। এইসব কাফেরদের বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে কেমন করে খতম করলে?

বাতেন ॥ বন্দোবস্ত খুব পাকা ছিল হুজুর। কারো দু'টো চোখ উপড়ে নিয়েছি, কারো মুখের মধ্যে গরম লোহার রড আহিস্তা আহিস্তা ঢুকিয়ে দিয়েছি। কোনো কোনো কাফেরের সিনা চিরে কলিজা টেনে আনলাম। মাগীগুলোকে হাত-পা বেঁধে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলাম। কারো শরীর থেকে চামড়া চড় চড় করে টেনে নিলাম, তারপর মরিচ আর নুন ছিটিয়ে দিলাম চর্বিতে।

সাদেক ॥ মারহাবা! হারামজাদা আর হারামজাদীরা তখন খুব ছটফট করছিলো তো! তোমার দিলে রহম পয়দা হয়নি?

বাতেন ॥ রহমত? লাহুলবিল্লা, মহান আদর্শের জন্য শয়তানদের খতম করেছি। ওরা যখন পানি খাবার জন্য মুখ খুলছিল, তখন আমরা ছড়ছড় করে পেচ্ছাব করে দিয়েছি।[২২]

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের খুঁজে খুঁজে বের করে নির্মমভাবে হত্যা করার পেছনে মূল উদ্দেশ্য কী ছিল পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের? কোন অভিসন্ধি চরিতার্থ করতে চেয়েছিল তারা? একটিই উত্তর– সমগ্র বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করা; মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জিত হলেও আমরা যেন স্বাধীন দেশের প্রশাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা, গবেষণা ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হই। তাই তো পাকিস্তানি হায়েনার দল এবং তাদের পদলেহী এদেশীয় দালাল আলবদর, রাজাকার, আলশামস্‌রা নিষ্ঠুরভাবে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে জীবনাবসান ঘটিয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাধর অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব [১৯০৭-১৯৭১], জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা [১৯২০-১৯৭১], মুনীর চৌধুরী [১৯২৫-১৯৭১], মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী [১৯২৬-১৯৭১], আনোয়ার পাশা [১৯২৮-১৯৭১], গিয়াসউদ্দিন আহমদ [১৯৩৫-১৯৭১], রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবিবুর রহমান [১৯৩২-১৯৭১], বিশিষ্ট সাহিত্যিক-সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার [১৯২৬-১৯৭১], জহির রায়হান [১৯৩২-১৯৭২], নিজামুদ্দীন আহমদ [১৯২৯-১৯৭১], সিরাজুদ্দীন হোসেন [১৯২৯-১৯৭১], সেলিনা পারভীন [১৯৩১-১৯৭১], আ. ন. ম. গোলাম মোস্তফা [১৯৪০-১৯৭১], সৈয়দ নাজমুল হক [১৯৪১-১৯৭১], মেহেরুন্নেসা [১৯৪৬-১৯৭১], চিকিৎসক ফজলে রাব্বি [১৯৩২-১৯৭১] এবং স্বনামধন্য সাংস্কৃতিক সংগঠক ও সুরকার আলতাফ মাহমুদ [১৯৩৩-১৯৭১]-সহ অসংখ্য বুদ্ধিজীবীর। বাংলাদেশের বুক চিরে উঠে আসা এই শহীদ বুদ্ধিজীবীগণ তাঁদের জীবন দিয়ে আমাদেরকে স্বাধীনতার স্বাদই শুধু দিয়ে যাননি, আমাদের জন্য রেখে গেছেন একটি অনুকরণযোগ্য আদর্শ এবং গর্বিত ঐতিহ্য। সমগ্র বাঙালি জাতির যাপিত জীবনে তাই বাংলাদেশের স্বর্ণসন্তান বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের ইতিহাস এক সকরুণ অধ্যায়।

নয় মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রান্তিক পর্যায়ে যুদ্ধ পরিস্থিতির দৃশ্যপট বদলাতে শুরু করলে, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ভোরবেলায় বর্ণচোরা গোলাম সাদেক খান উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে বাংলাদেশের দামাল মুক্তিবাহিনীর

হাতে পাকিস্তানি সৈন্যদের পরাজয় প্রায় সুনিশ্চিত; এবং বিজয়ের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে অনিবার্য ধারাবাহিকতায় মুজিবকোট পরে আবারও ঘটে তার বর্ণান্তর– ছদ্মবেশ ধারণ করে সে হয়ে ওঠে একজন নিবেদিতপ্রাণ দেশপ্রেমিক, অসমসাহসী মুক্তিযোদ্ধা :

সাদেক ॥ যাক, সব চলে যাক। আমার সব কিছু ভেঙেচুরে খান খান হয়ে যাক। আমি বাঁচতে চাই না। ভাইসব, আপনারা গুলী করে আপনাদের হতভাগ্য প্রবীণ নেতাকে হত্যা করুন। একটা আনফরচুনেট, আনব্লেশেড মানুষকে কতল করুন। তবু ক্ষমা চাই ভাইসব। যদি বিশ্বাস না হয় দেখুন, আপনারা দেখুন আমি নিজের হাতে আমার চল্লিশ বছরের পোশাক খুলে ফেলছি, দেশের খাঁটি পোশাক পরছি–

[শেরওয়ানী খুলে মুজিবকোট পরল]

আজ এই আমার পরিচয়, আমি বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিতে চাই। আমিও বলতে চাই, এই প্রবীণ নেতা আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলতে চায় : এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।[২৩]

কিন্তু গোলাম সাদেকের আত্মতৃপ্তি ও রঙিন স্বপ্নের জাল ছিন্ন হয়ে যায় রিরংসা-তাড়িত পাকিস্তানি সৈন্যের হিংস্র থাবায় লাঞ্ছিতা পুত্রবধূ বর্ণালী ও পুত্র মতিউর রহমানের আকস্মিক আগমনে; শতসহস্র জনতার সামনে তার চরিত্রের প্রকৃত সত্যস্বরূপ উন্মোচিত হয়ে যায় মতিউরের হার্দিক যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত সংলাপভাষ্যে :

মতিউর ॥ একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমি আর বর্ণালী শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে এসে দেখলাম আমাদের পলাশ কথা বলে না, হাসে না। পলাশের শরীর ঠাণ্ডা, পলাশ মরে পড়ে আছে। তোমার কাছে আমাদের পলাশের অপরাধ, একুশে ফেব্রুয়ারিতে পলাশের জন্ম হল কেন!...

আমরা তো জানি তুমি দুধের মধ্যে বিষ মিশিয়ে আমার পলাশকে হত্যা করেছিলে সেদিন।... শান্তি চাও? শুধু তুমি শান্তি চাও? আমিও শান্তি চেয়েছিলাম, শান্তি চেয়েছিল আমার বর্ণালী; রব, কুলসুম, এদেশের কোটি কোটি মানুষ। সেজন্য তুমি আর তোমার শ্রেষ্ঠ সৈনিকরা এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছ। আমাদের সুখের ঘরকে বিষাক্ত করেছ।... তোমরা

আমার সোনার বাংলায় পুঁজিপতি আর সাম্রাজ্যবাদীদের ডেকে এনেছ। তারা আমাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছে। এখন জ্বালা আর সর্বনাশের শেষ সীমায় তোমার আমার দেখা। বল, কে মরবে?[২৪]

সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মতো মতিউর রহমানও তার বেঈমান-বিশ্বাসঘাতক বর্ণচোরা রাজাকার পিতাকে ক্ষমা করতে পারেনি; স্ত্রী বর্ণালীর হাতে অস্ত্র তুলে দেয় সে এবং শেষ পর্যন্ত বর্ণচোরা খান গোলাম সাদেক খানের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায় নির্মম মৃত্যুর মধ্য দিয়ে :

মতিউর ॥ বর্ণচোরা, কেউ আর তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। কেউ না। বর্ণালী, আমার ঐ বাবার কপালে পিস্তলটা রেখে ট্রিগার টিপে ওকে হত্যা কর। শোভন কর দেশকে। পলাশ আর শাপলাগুলো প্রাণ ভরে ফুটুক এবার বাংলাদেশে।[২৫]

১৯৭২ সালে রচিত *বর্ণচোরা* নাটকের প্রাসঙ্গিকতা স্বাধীনতার পাঁচ দশক পরেও বাংলাদেশের সমাজবাস্তবতায় বিবর্ণ হয়নি এতটুকু; বরং বাঙালির রাজনৈতিক নিয়তির নির্মমতা এই যে, খান গোলাম সাদেক খানের মতো একদা পাকিস্তানপন্থী সুবিধাবাদী যে দালালশ্রেণি অস্তিত্বের প্রয়োজনে ক্ষমা ভিক্ষা করে মিশে যেতে পেরেছিল সর্বস্তরের বাঙালি জনতার সঙ্গে, কিংবা মিশে যাবার সুযোগ পেয়েছিল– সময়ের নিষ্ঠুর পরিহাসে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে সেই তাদের আজ এমনই প্রবল প্রতাপ; উপরন্তু স্বাধীন বাংলাদেশবাদীদেরকেই সময়ে-সুযোগে বর্ণান্তর ঘটাতে দেখা যাচ্ছে বেমালুম– কখনো স্বার্থের প্রয়োজনে, কখনো-বা অস্তিত্বেরও প্রয়োজনে।

ছয়.

মমতাজউদদীন আহমদের *বিবাহ* (১৯৮৫) এবং *কী চাহ শঙ্খচিল* (১৯৮৫) নাটকদ্বয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাট্যসাহিত্যের ধারায় অনবদ্য সংযোজন। *বিবাহ* নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় যদিও ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলন, তবুও তা ইতিহাসের ক্রমধারায় মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক নাটক *কী চাহ শঙ্খচিল*-এর কাহিনীবৃত্তের সাথে একীভূত ও একাত্ম। এই নাটকদ্বয়ে ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধের চৈতনিক সত্তার উত্তরণ ঘটেছে মূলত। নাট্যকার মমতাজউদদীন আহমদের ভাষ্য এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

স্বাধীনতা-যুদ্ধের পটভূমিতে কী চাহ শঙ্খচিল-এর বিষয় নির্ধারিত। 'বিবাহ' নাটকের সখিনা এবং 'কী চাহ শঙ্খচিল' নাটকের রৌশন আরা আবেগ ও যন্ত্রণার সূত্রে আমার কাছে অভিন্ন চরিত্র। বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন এবং একাত্তরের যুদ্ধ স্বাধীনতার শপথে যেমন ধারাবাহিক সূত্রে গ্রথিত, তেমনি 'বিবাহ' ও 'কী চাহ শঙ্খচিল' একই আবেগ ও বেদনার ধারাবাহিক বিকাশ।[২৬]

বিবাহ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সখিনা। বিয়ের মাত্র দুদিন পূর্বে একুশের মিছিলে হবু স্বামীকে বিসর্জন দিয়ে তার বিয়ে-পূর্ব বৈধব্যবরণ। শহীদ হবু স্বামীর স্মৃতির সাথে বসবাসের ভেতরেই নাটকের যবনিকা। তবু, *বিবাহ* নাটকের তাৎপর্যটি হয়তো এখানেই যে, সখিনার ভেঙে যাওয়া স্বপ্নের প্রাপ্তিযোগ হবু স্বামীর আত্মোৎসর্গে। সামাজিক বিয়ে তার হয়নি, কিন্তু বিয়ের অর্থ যদি হয় বন্ধন, সে বন্ধন তার ঘটে গেছে অনেক আগেই– বাংলার সাথে, বাংলা ভাষার সাথে, বাঙালির চেতনার সাথে; অবিচ্ছেদ্যভাবে :

আমার তো সেই কবে বিয়ে হয়ে গেছে ছোট মামা। এক মধুমাসে ফাল্গুনে পাতা-ঝরা ছিল। কোকিলের গান, বসন্তের ফুলের গন্ধ, সানাইয়ের সুর বেজেছিল। আমার বিয়েটা হয়েছিল মহা-সমারোহে।... এক এক করে এমনি করে বায়ান্ন থেকে সাতান্ন বছর বেঁচে আছি। যতদিন বাঁচব, ওকে নিয়ে বেঁচে থাকব।[২৭]

আগ্রাসী পাকিস্তানি সৈন্যদের নৈতিকতাহীন ঔদ্ধত্য ও নারী-নির্যাতন অপরিমেয় যন্ত্রণা-বেদনার উৎসার হয়ে দেখা দিয়েছে *কী চাহ শঙ্খচিল* নাটকে। বস্তুত, মুক্তিযুদ্ধের সময় বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা ধর্ষিতা-নির্যাতিতা-সর্বহারা বাঙালি নারীদের অপরিসীম যন্ত্রণা, হাহাকার, মানসিক অস্থিরতা ও হৃদয়ের গভীর রক্তক্ষরণ মমতাজউদদীন আহমদ অত্যন্ত শৈল্পিক কুশলতায় রূপায়িত করেছেন এ-নাটকে। এ-ক্ষেত্রে *কী চাহ শঙ্খচিল* নাটকের নায়িকা রৌশন আরার অন্তিম সংলাপরাশি যেমন তীক্ষ্ণ, তীব্র, তেমনই তাৎপর্যময়, ব্যঞ্জনাবহুল :

যুদ্ধকে নিয়ে তোমরা ভাগ্য গড়ে নাও, সাধের সিংহাসন মজবুত কর, পৃথিবীর রঙকে মলিন কর। আমি তো প্রতিবাদ করিনি, আমি তো সূর্যের আলোতে মুখ দেখাতে চাইনি; কিন্তু আমার সন্তানকে নিয়ে তোমরা বাণিজ্য গড়তে চাও কেন? আমার সন্তানের পরিচয়কে তোমরা অপবিত্র কর কেন?...

স্বাধীনতা? কার স্বাধীনতা? কেমন স্বাধীনতা? মায়ের কোলে বাচ্চা নাই, মানুষের চোখে নিদ নাই, নদীর বুকে পানি নাই। কেমন স্বাধীনতা? তোমার মাথার উপর থাইক্কা উড়া জাহাজের মতন জল্লাদ পাখি তাড়াইতে পারবা? তোমরা বইনের মুখ থাইক্কা লাঞ্ছনা মুছতে পারবা? আমার মাথার আগুন নিভাইতে পারবা?[২৮]

'কী চাহ শঙ্খচিল' মঞ্চনাটকের একটি দৃশ্য

এই সেই কণ্ঠস্বর (১৯৮৬) নাটকের রাবেয়া চরিত্রটি *বিবাহ* নাটকের সখিনা চরিত্রেরই পুনঃরূপায়ণ বলা যেতে পারে। সখিনা যেমন তার হবু স্বামীকে বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলনের উত্তাল মিছিলে হারিয়ে ফেলেছিল, বাঙালি জাতিসত্তার সামূহিক চেতনাকে বরণ করে নিয়েছিল অবিচ্ছেদ্য বিবাহবন্ধনে; ঠিক তেমনি *এই সে কণ্ঠস্বর* নাটকের নায়িকা রাবেয়াও বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতাযুদ্ধে প্রিয়তম স্বামীকে হারিয়ে অকালবৈধব্য বরণ করেও আমৃত্যু স্বামীগৃহেই রয়ে যাবার প্রত্যয়ে থেকেছে স্থির। স্বামীর জন্য তার প্রতিশ্রুত অনন্ত প্রতীক্ষা যেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার সোনালি স্বপ্নসম্ভাবনারই প্রতীকী প্রতীক্ষা। স্বাধীনতার প্রায় দেড় দশক অন্তে রচিত *বিবাহ* এবং *এই সে কণ্ঠস্বর* নাটকদ্বয়ের মৌল তাৎপর্যটি নিহিত এখানেই। বলা যেতে পারে, নাটক দুটি দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ, জটিল এক রক্তাক্ত সময়পুঞ্জে চারদিকের ব্যাপ্ত বিপর্যয়ে সব হারানো রিক্ত কিছু মানুষের নিরন্তর

আশায় বসতির সংবাদ হয়তোবা এখনো স্বপ্নবান প্রাণগুলোতে একমুঠো শক্তিসঞ্চারী ভূমিকায় অবতীর্ণ।

মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে, বিশেষত ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হবার পর বাংলাদেশের সর্বস্তরে বিরাজিত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামূহিক বিপর্যয়, সুস্থ মূল্যবোধের অবক্ষয়, শ্রেণিবৈষম্য, সর্বস্তরের বাঙালির মনন ও চৈতন্য থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভুলিয়ে দেবার সর্বাত্মক অপচেষ্টা এবং প্রশাসনিক অব্যবস্থা ও অনিয়ম যুদ্ধফেরত তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের মনে যে নিদারুণ হতাশা, ক্ষোভ ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করে তাদের তরুণ হৃদয়কে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত ও সংক্ষুব্ধ করে তুলেছিল– তারই সত্যস্বরূপ অত্যন্ত শৈল্পিক-নৈপুণ্যে উন্মোচিত হয়েছে মমতাজউদ্‌দীন আহমদের *ফলাফল নিম্নচাপ* (১৯৭৬), *ক্ষতবিক্ষত* (১৯৮৬) এবং *পুত্র আমার পুত্র* (১৯৯৪) নাট্যত্রয়ীতে। কিশোরদের জন্য লিখিত তাঁর *বকুলপুরের স্বাধীনতা* (১৯৮৬) নাটকটিতেও বাংলাদেশের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের অনির্বাণ চেতনার সঞ্চরণ লক্ষ করা যায়। এই নাটকে একদিকে যেমন পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনামলের শোষণ-বঞ্চনা, অত্যাচার-পীড়ন প্রতীকী ব্যঞ্জনায় দ্যোতিত, অন্যদিকে তেমনি বাঙালি জাতির উত্থানের প্রেরণাও চিত্রিত হয়েছে শৈল্পিক-নিষ্ঠায়। বস্তুত, বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের প্রতারণা, হীনম্মন্যতা, ভণ্ডামি এবং মনুষ্যত্বহীনতার কাহিনি আর বাঙালি জাতিসত্তার চেতনাগত সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমার ইতিবৃত্ত মমতাজউদদীন আহমদের *বকুলপুরের স্বাধীনতা* নাটকের মূল উপজীব্য।

উপসংহার :

মমতাজউদদীন আহমদের মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গবাহী নাটকগুলো বিশ্লেষণ করলে কেবল তাঁর শিল্পীসত্তারই নয়, সমগ্র বাঙালি জাতিসত্তার ক্রম-রূপান্তরের ইতিহাসও অনেকটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর মানবজীবনের সংকটদীর্ণ ও রক্তাক্তস্বরূপ উন্মোচনে তিনি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাট্যমালায় গ্রহণ করেছেন বিশ্লেষণাত্মক পরিচর্যারীতি; ফলে, চরিত্রায়ণরীতিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে ব্যক্তিমানসের দৃষ্টিকোণ, অন্তর্ভাবনা, স্বগতকথন ও মনোবিশ্লেষণ। বলাবাহুল্য, মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গবাহী নাটকসমূহে কাহিনি-বিন্যাস এবং চরিত্রায়ণ পদ্ধতি ও চরিত্র-পরিকল্পনার নেপথ্যে তীব্র হয়ে উঠেছে মমতাজউদদীন আহমদের যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর সময়প্রবাহে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞান, সমাজসংলগ্নতা, মেধাবী পর্যবেক্ষণ শক্তি। তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাট্যসাহিত্যে যেমন একদিকে

রূপায়িত হয়েছে যুদ্ধকালীন ভয়াল দিনরাত্রির ইতিকথা, যুদ্ধক্ষত-রক্তাক্ত ব্যক্তিমানসের ভীতি, আতঙ্ক, বিপন্ন ও বিপর্যস্ত জীবনপ্রবাহ, সমগ্র বাঙালি জাতির শোক-তাপ, দুঃখ-ক্ষোভ ও যন্ত্রণা, হিংস্র পাকিস্তানি নরপশুদের নির্বিচারে পীড়ন-নির্যাতন, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের মর্মান্তিক চিত্রমালা; তেমনি অন্যদিকে শিল্পিত হয়েছে মাতৃভূমির জন্য নিবেদিতপ্রাণ অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা, বাঙালির সশস্ত্র প্রতিরোধ ও সংগ্রাম; এবং একই সঙ্গে তাঁর নাট্যসাহিত্যে শিল্পিত হয়েছে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের সর্বস্তরে স্বপ্নভঙ্গের নিগূঢ় যন্ত্রণা, অসীম ক্লেশ ও গ্লানি, অস্তিত্বহীনতা, বাঙালি জাতিসত্তার পরাজয়ক্লিষ্ট মুখচ্ছবি এবং বহুমূল্যে অর্জিত স্বাধীনতার মোহভঙ্গজনিত চরম হতাশা ইত্যাদি বহুবর্ণিল প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ। বলতে দ্বিধা নেই, মমতাজউদদীন আহমদের শিল্পীমানস কেবল তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটকগুলোর বহিরঙ্গে রং ফুটিয়েই তৃপ্ত থাকেনি, সেই প্রসাদগুণ তাঁর নাটকসমূহের মজ্জায় মজ্জায় সংযত আবেদন, বাহুল্যবর্জন ও ইঙ্গিতময় সৌকর্যে অন্তর্লীন এবং মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকালীন সমাজমুখী ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অবলোকন শক্তিতে পরিস্নাত। বলা বাহুল্য, নাট্যকার মমতাজউদ্‌দীন আহমদের ব্যক্তিচরিত্র পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা মানবজীবন ও মানবসত্তার গভীরতল প্রদেশে সতত ক্রীড়াশীল। এই তীব্র, তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদী জীবন ও সমাজসত্য পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার অনন্য বৈশিষ্ট্যই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাশ্রয়ী বাংলা নাট্যসাহিত্যের সুবিস্তৃত অঙ্গনে তাঁর সুনির্দিষ্ট আসন চিহ্নিত করেছে এবং তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে সাফল্যের শীর্ষবিন্দুতে।

তথ্যনির্দেশ

১. আবুল, মুহম্মদ, (১৯৯৮), 'বরেন্দ্র অঞ্চলের নাটক ও নাট্যচর্চা', *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাসগ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি, রাজশাহী, পৃ. ১০১৮।

২. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, (১৯৯৯), 'বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের নাট্য-সাহিত্যের ধারা (১৯৭১-১৯৯৫)', *বাংলাদেশের নাট্যচর্চার তিন দশক*, সম্পা. রামেন্দু মজুমদার, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ১৯৮।

৩. আহমদ, মমতাজউদদীন, (১৩৯১), সংকট ও নাট্যকর্ম, *সাহিত্য পত্র- ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা*, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ. ৩৭।

৪. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, 'বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের নাট্য-সাহিত্যের ধারা (১৯৭১-১৯৯৫)', পূর্বোক্ত, পৃ. ২০০।

৫. আজাদ, আলাউদ্দিন আলী, (১৯৭৪), *সাহিত্যের আগন্তুক ঋতু*, মুক্তধারা, ঢাকা, পৃ. ৫৭-৫৮।

৬. আহমদ, মমতাজউদদীন, (১৯৭৭), 'গ্রন্থ প্রসঙ্গ', *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৭. আহমদ, মমতাজউদদীন, 'স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা', পূর্বোক্ত।

৮. তদেব।

৯. তদেব।

১০. তদেব।

১১. আহমদ, মমতাজউদদীন, 'এবারের সংগ্রাম', স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, পূর্বোক্ত।

১২. তদেব।

১৩. তদেব।

১৪. তদেব।

১৫. জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ, নাটক বিষয়ক পঠিত প্রবন্ধের ওপর আলোচনা, 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যের রূপান্তরঃ বিষয় ও প্রকরণ', *একুশের প্রবন্ধ-১৯৮৮*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১২৭-১২৮।

১৬. আহমদ, মমতাজউদদীন, 'স্বাধীনতার সংগ্রাম', স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, পূর্বোক্ত।

১৭. তদেব।

১৮. তদেব।

১৯. তদেব।

২০. আহমদ, মমতাজউদদীন, 'গ্রন্থ প্রসঙ্গ', বর্ণচোরা, স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা, পূর্বোক্ত।

২১. মোজাহার, সেলিম (২০০৮), 'স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকাকেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ৬৮।

২২. আহমদ, মমতাজউদদীন, '*বর্ণচোরা*', পূর্বোক্ত।

২৩. তদেব।

২৪. তদেব।

২৫. তদেব।

২৬. আহমদ, মমতাজউদদীন, 'ভূমিকাংশ', বিবাহ ও কী চাহ শঙ্খচিল, ১৯৮৫, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

২৭. আহমদ, মমতাজউদদীন, ‘বিবাহ’, বিবাহ ও কী চাহ শঙ্খচিল, পূর্বোক্ত।

২৮. আহমদ, মমতাজউদদীন, ‘কী চাহ শঙ্খচিল’, বিবাহ ও কী চাহ শঙ্খচিল, পূর্বোক্ত।

আলোচিত নাটক

আহমদ, মমতাজউদদীন : ‘স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা’, *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা*, (১৯৭৭), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

: ‘এবারের সংগ্রাম’, *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা*, (১৯৭৭), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

: ‘স্বাধীনতার সংগ্রাম’, *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা*, (১৯৭৭), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

: ‘বর্ণচোরা’, *স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতা*, (১৯৭৭), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

: ‘বিবাহ’, *বিবাহ ও কী চাহ শঙ্খচিল*, (১৯৮৫), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

: ‘কী চাহ শঙ্খচিল’, *বিবাহ ও কী চাহ শঙ্খচিল*, (১৯৮৫), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

: ‘ফলাফল নিম্নচাপ’, *নির্বাচিত নাট্যসম্ভার*, (১৯৯৯), বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।

: ‘ক্ষতবিক্ষত’, *নির্বাচিত নাট্যসম্ভার*, (১৯৯৯), বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।

: ‘পুত্র আমার পুত্র’, *নির্বাচিত নাট্যসম্ভার*, (১৯৯৯), বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।

: ‘বকুলপুরের স্বাধীনতা’, *নির্বাচিত নাট্যসম্ভার*, (১৯৯৯), বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।

: ‘এই সেই কণ্ঠস্বর’, *নির্বাচিত নাট্যসম্ভার*, ১৯৯৯, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, আলাউদ্দিন আল, (১৯৭৪), *সাহিত্যের আগন্তুক ঋতু*, মুক্তধারা, ঢাকা।

আহমদ, মমতাজউদদীন (১৩৯১), *সংকট ও নাট্যকর্ম*, সাহিত্য পত্র- ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মুক্তধারা, ঢাকা।

আহমেদ, সৈয়দ জামিল, (১৯৯৫), *হাজার বছর বাংলাদেশের নাটক ও নাট্যকলা*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

কবির, শাহরিয়ার, (১৯৮৮), *একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়*, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ঢাকা।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ, (২০০৯), *বাংলাদেশের সাহিত্য*, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা।

চৌধুরী, কবীর, (১৯৯২), *বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা*, র‌্যাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশন্স, লন্ডন।

বিশ্বাস, সুকুমার (১৯৯৮), *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মজুমদার, রামেন্দু (সম্পা.), (১৯৯৯), *বাংলাদেশের নাট্যচর্চার তিন দশক*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

মোজাহার, সেলিম, (২০০৮), *স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকাকেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

রহমান, আতাউর, (১৯৯৫), *নাট্য প্রবন্ধ বিচিত্রা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হায়দার, জিয়া, (১৯৯১), *বাংলাদেশের থিয়েটার ও অন্যান্য রচনা*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

হাসান, মঈদুল, (১৯৮৬), *মূলধারা'৭১*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

হোসেন, মোবারক (সম্পা.), (১৯৯৫), *একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ (১৯৬৩-১৯৭৬)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

লেখক পরিচিতি: **মোরশেদুল আলম**, পিএইচডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল
১২৫/এ, এ. ডব্লিউ, চৌধুরী রোড
দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

www.nimc.gov.bd